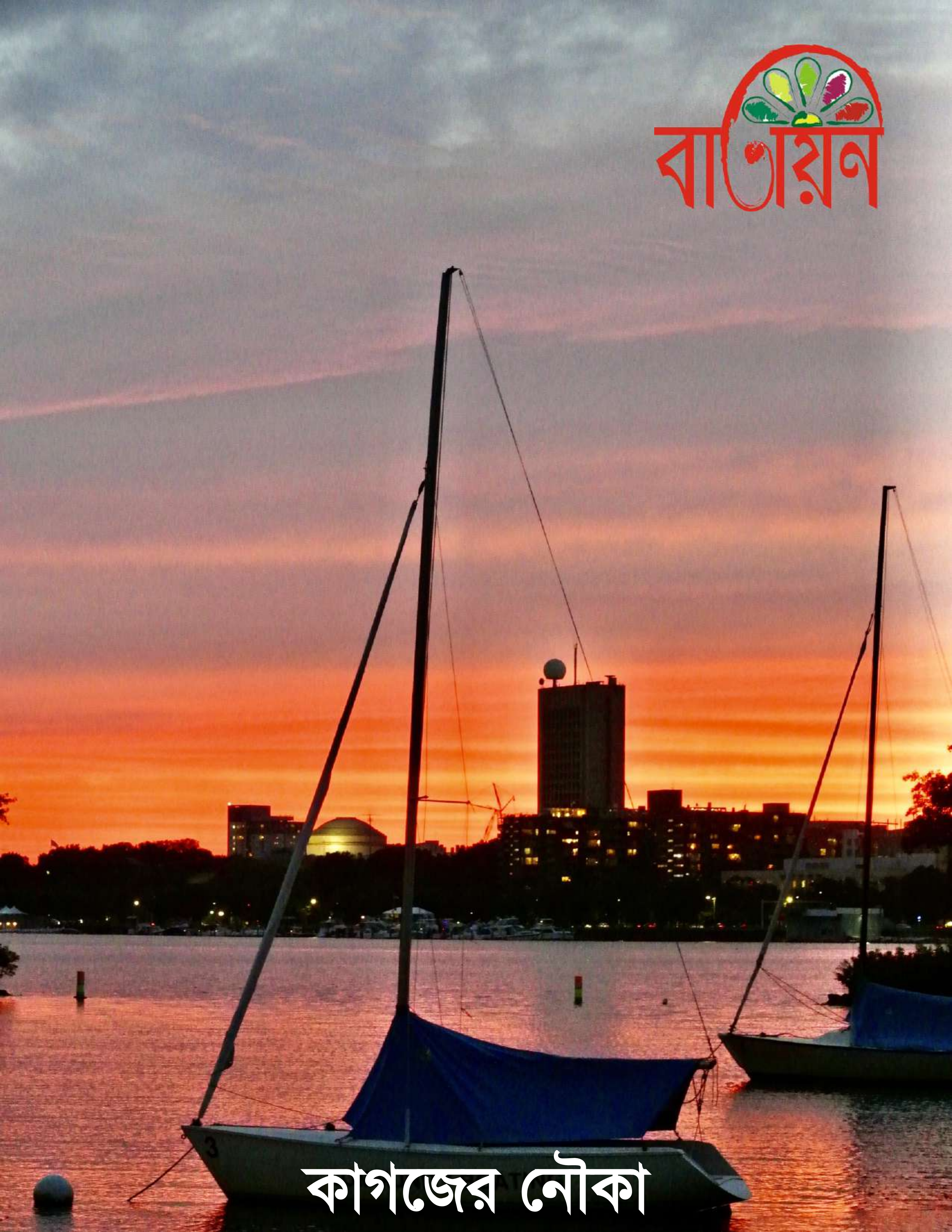

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

প্রতিচ্ছবি

নীল ? সে ভীষণ প্রিয়, ছিল সে জনপ্রিয়,
তোমার প্রতিচ্ছবি জানি,
আকাশ ? সে আজ বলে: "প্রতিচ্ছবিটুকু জলে"
স্মৃতির ছায়াছবি খানি ...

সঞ্জয়

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

১৯তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 19 : February 2022

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das — **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Urmi Chakraborty — **Inside Front Cover - Hawkesbury River, Sydney**

উর্মি চক্রবর্তী – ইকোনমিক্সের মাস্টার্স করার ঝকমারি সামলে পুরো দস্তুর নানা কাজে যুক্ত। সাথে রয়েছে শায়েরীর খাতা ও ক্যামেরা। বাতায়ন ও অন্যান্য অনলাইন ম্যাগাজিনে লেখালেখি অনেক দিনের। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতি'তে ডিপ্লোমা করা। তার লেখা লিরিক্সে গান করেছেন কলকাতার নামী শিল্পী'রা। বর্তমানে পাকাপাকি ভাবে সিডনি নিবাসী। রান্না করতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসেন। দেশ বিদেশের রকমারি রান্নার একটি ব্লগ চালান পাশাপাশি।

Supratik Mukherjee — **Title Page - Flowers from the Garden**

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Tirthankar Banerjee — **Back Cover - Bidalup False, Pembertor**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

"বুকের প্রপাত ঝরে যায়
এতগুলো ডিঙা তুমি কোথায় পেয়েছ ভুলে যাই
বুকের প্রপাত ঝরে যায় ..."

দিন কয়েক আগেই কবির জন্মদিন গেলো। প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা থেকে ক'লাইন ধার নিতে হয় যখন ২০২২ এর বাতায়নের ডিঙি নৌকা বা সবার আদরের "কাগজের নৌকা" তার ঊনবিংশতম সংখ্যা সাম্প্রতিক হাজার প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে বরাবরের মতো নোঙর বাঁধতে আসছে পাঠকের মনের বন্দরে। নতুন বছরে লেখক ও পাঠকের এই মেলবন্ধনের শান্ত সমারোহের সাক্ষী থাকুক নৌকা, পাঠকের প্রিয় কাগজের নৌকা।

তবুও এর মাঝে বিষাদের করুণ তন্ত্রী বেজে ওঠে আজকাল। গানের জগৎ-কে স্তব্ধ করে চলে গেলেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণজ্বল বাপি লাহিড়ী। সুর ও কথার জাদুকরদের মুখে চন্দনপ্রলেপ মাখিয়ে অন্তিম যাত্রায় এগিয়ে দিলো আপামর মানুষ। তাদের মতো বাতায়নও শোকস্তব্ধ।

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন

"প্রচ্ছদ পড়ুক চোখে, শান্ত হোক শিরা
ভুলুক দিনের যত সমবেত ভুল
দুঃখ রেখে যাক মুখে চন্দনপ্রলেপ
ফিরে যাক এসেছিল যে প্রতিবেশীরা
পায়ে শুধু পড়ে থাক স্তব্ধ এলোচুল"

সেই শান্ত স্তব্ধতার আবহে নিশ্চিত জানি যে কাগজের নৌকা পৌঁছবে পাঠকের হাতে, কারণ লেখা যে পাঠককে খোঁজে, পাঠকও লেখা'কে খোঁজে তার কাগজের নৌকার সাথে ...

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সূচীপত্র

কবিতা

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়	**সেই দিন –**	5
	মোহমায়া ...	5
শঙ্খ ভৌমিক	বাবা দিবস	6
তপনজ্যোতি মিত্র	**সব কবিতা মিল খুঁজেছে শেষে**	7
	সেই ভুবনে কাব্যমায়া	7
পারিজাত ব্যানার্জী	**যজ্ঞ সারথি স্তব**	8
	যোগিনীর ভগ্ন কুটীরে তপ	8

ধারাবাহিক

শ্যামলী আচার্য	**সুখপাখি**	9
রমা জোয়ারদার	**চা-ঘর**	22
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	27
শকুন্তলা চৌধুরী	**পরবাসী**	36
প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	**পুরোনো দিনের কথা**	46
প্রশান্ত চ্যাটার্জী	**MCTE-MHOW**	50
নিলয় মুখার্জী, জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ পাল	**ভান**	54
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	**চল নিধুবনে**	64

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

সেই দিন –

সেদিন
কোজাগরী চাঁদ
ধানছড়া হাতে
অকৃপণ সাজিয়েছিল
উৎসবের রাত

মৃদুমন্দ হাওয়া
উড়িয়েছিল
আকুল জ্যোৎস্নার খাম
হয়ত ঠিকানায় ছিল
দুরন্ত এক বিষাদ
আর সৌম্য এক
বিরহের নাম

তাই কী
সেই ক্ষণিকের
তরে পাওয়া !

উদাসীন ছিল ভঙ্গিমা
তবু তীব্র সে দৃষ্টিতে
দীর্ঘ ছেয়ে ছিল
তার কল্যাণময় চাওয়া

মোহমায়া ...

রয়ে যায়
অলীক কিছু ঋণ,
পবিত্র তাম্র পত্রে
যেন পুষ্প অমলিন

অলৌকিক
কোন মুহূর্ত পাতায়
নিস্কলুষ চিরকালীন

যেন হৃদয়গহীন
এক সুমধুর ব্যথায়
শব্দহীন

অন্তর্লীণ
এক মোহের
সাকিন

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় – উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার শেষে কিছুদিনের শিক্ষকতা-জীবন। তারপরেই প্রবাসে পাড়ি। গত বাইশ বছর যাবৎ ঠিকানা নিউ জার্সি। পেশায় মন্তেসরি শিক্ষিকা। ২০০৮ সাল থেকে ছদ্মনামে ব্লগলেখা শুরু। ২০১০ থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পত্রপত্রিকা ও শারদীয়াতে নিজের নামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা চলতে থাকে, কমিউনিটির বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের পাশাপাশি নাটক ও সঞ্চালনা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

শঙ্খ ভৌমিক

বাবা দিবস

বাবা —

Facebook এ তোমার একটা ছবি Post করবো বলে
অনেক খুঁজেছি আমি —
পুরোনো দেরাজে ন্যাপথলিন মোড়া ভঙ্গুর মুহূর্তে,
ব্যলকনি বেয়ে চুপিসাড়ে মিইয়ে যাওয়া বিকেলে, আর
ছাদের এন্টেনায় লেগে থাকা ‘‘ভারত এক খোঁজ’’ — এর সুরে
কেউ কেউ বলল —
একটু খুঁজে আয় রাস্তায়, কুড়িয়ে পেতে পারিস পুরোনো ছবি ।
সেই থেকে গঞ্জে ঘুরেছি আমি স্টীমার করে,
লালগোলা প্যাসেঞ্জার কবে আটকে গেল হঠাৎ জেগে ওটা কাঁটাতারে —
মহাকাশ ঘুরে আসা Space-EX হাতড়ে এল বায়ুমন্ডল
তোমার ছবির খোঁজে —

বরাট জেঠু বলেছিল পাহাড়ে গেছে তোর বাবা নতুন রাস্তা বানাতে,
নতুন শহর হচ্ছে মিরিক, তার গোলাপ বাগিচায় ছবি ওঠে ভাল ।
পাহাড় ভেঙে উঠে এল ছিন্নভিন্ন লাশ আর লাল পাপড়ি
ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে বাবার বানানো রাস্তা ধরে ফিরে এসেছি বহুদিন —

কিন্তু তোমার ছবি upload হচ্ছে না Facebook এ
একে একে Error মেসেজে ভরে যাচ্ছে বুক আর ডুবে যাচ্ছি আমি
ওরা আমায় দেওয়ালে তোমার ছবি টাঙাতে দিল না ।

শঙ্খ ভৌমিক – পেশায় অধ্যাপক; নেশায় নাট্যছাত্র ও সাহিত্যপ্রেমী। অভিবাসী জীবনের টুকরো যাপন নিয়ে কখনো নাটক, কখনো ছোট গল্প লেখা।

তপনজ্যোতি মিত্র

সব কবিতা মিল খুঁজেছে শেষে

তোমার আছে একটি খোলা আকাশ
তোমার আছে স্বচ্ছতোয়া নদী
তোমার আছে মুক্ত গতির বাতাস
তোমার আছে ভালোবাসার বীথি

কবির আছে একটি নীল পাহাড়
কবির আছে একটি মাঠের পথ
কবির আছে একটি ঘোড়ার সওয়ার
কবির আছে ভালোবাসার রথ

কখন যেন মেঘে আকাশ দীঘল
কখন মেশে সাগর বালিয়াড়ি
কখন যেন ঝর্ণা নামে উপল
কখন কোথায় ভালোবাসায় দাঁড়ি

কখন গেলে মোহনারই কাছে
গেছো সমুদ্রেরই পারে
রূপকথারই হাজার গল্প আছে
দিন চলেছে দিগন্তিকা ঝড়ে

নাই বা হল সাগরপারে যাওয়া
নাই বা হল আনন্দ উৎসব
দিনের শেষে তবু অনেক পাওয়া
ফুলের পরে ফুল ফুটেছে সব

এই ত আমি তোমার কাছে এসে
ভালোবাসায় মিশিয়ে দিলাম আলো
সব কবিতা মিল খুঁজেছে শেষে
এমনি করেই জীবন বড় ভালো

সেই ভুবনে কাব্যমায়া

আমি যখন তোমার কাছে, তোমার মাঠে আসতে পারি
আমার জন্যে খুলে দেবে আলোক সেই বসতবাড়ি ?

আমি যখন হাওয়ার দোলায় মেঘের মত আকাশ জুড়ে
তখন তুমি তান তুলবে কবির ভাষায়, গানের সুরে ?

যখন সব পথের শেষে রইবে তোমার কোন পৃথিবী
তখন তুমি জাগিয়ে দিও তোমার প্রিয় স্বজন কবি

যখন তোমার ধূসর চোখে শূন্য মাঠের বিষণ্ণতা
হাজার ঢেউয়ের মাঝখানেতেও বালি জুড়েই নির্জনতা

কেমন করে তোমার ভাঙা স্বপ্ন হবে গল্প কথা ?
তেপান্তরের মাঠের পারের সেই যে হাজার রূপটি কথা ?

দুখেই থেকো, সুখেই থেকো – বসতবাড়ি ভেঙেই পড়ে ?
তখন যেন কাব্যমায়া সেই ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা ‘বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি’, ‘অমৃতের সন্তানসন্ততি’, ‘ঈশ্বরকে স্পর্শ’, ‘মায়াবী পৃথিবীর কবিতা’, ‘সুধাসাগর তীরে’, ‘সে মহাপৃথিবী’, ‘আকাশকুসুমের পৃথিবী’ । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

পারিজাত ব্যানার্জী

যজ্ঞ সারথি স্তব

অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপনীত হয়েছে জানি,
তবু কালচক্রের ঘূর্ণন আজও কেমনে রোখা যায়নি ?

সাদা ঘোটকপিঠে ঘোড়সওয়ার বসে ওদিকে মৃত্যুবাণ হানে –
এপাড়ে গর্ভগৃহের ভেঙে পড়ে আধার, মেহগনি কাঠের দেবতাও দেখি নিশ্চিন্তে হার মানে !

প্রেমিকার আজ ফুল কুড়োতে তবু এত দেরী কেন ?
ওর চোখের নীরবে শান্তির দ্যুতিতে আড়াল কোথা যেন !

তবে কি আর প্রেমাকুলতা সাজেনা সন্ধ্যা নামলে –
এখন অবশ্য ঘোর কালো রাত – চন্দ্রকরও অস্তাচলে।

যোগিনীর ভগ্ন কুটীরে তপ

পুজোর ঘরের দোর আগলে বসে রয়েছি অনন্তকাল –
জানি থেমে যাবে যুদ্ধ প্রহসন যেদিন, সেদিনই জাগবে সকাল !

জপের অর্ঘ্যে যজ্ঞ পুরুষ সমাদৃত হবে সর্বদিকে –
প্রণয় আকুতি তখনও কি রবে ওর চপল কানন চোখে ?

ফুলের সাজি শুকিয়ে যেদিন কঙ্কালসার হবে,
সেদিনও বুঝি ও শান্তি স্তুতি নীরবে বসে আওড়াবে।

অশ্বমেধের ঘোড়ার লাগামে পুড়বে যেদিন ওর মনন –
সেদিন আমার উপোস রবে, করব প্রেমদিবস যাপন !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

শ্যামলী আচার্য

সুখপাখি

(১৩)

‘সত্য প্রেম পবিত্রতা’ এই ছিল অশ্বিনীকুমারের আদর্শ। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে ছাত্রসমাজের উন্নতির জন্য নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়াতেন তিনি। এ যেন তাঁর দায়। কী এক আশ্চর্য উদ্দীপনায় তিনি নিজে উত্তপ্ত হয়ে থাকেন আর অদ্ভুত শান্ত এক সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দেন তাঁর বক্তৃতায়। তাঁর কথায় সমাহিত ভাব; উদ্দীপিত করে, জ্বালা ধরায় না।

অশ্বিনী যখন বরিশালে আসেন তখন বরিশালে রাজনীতির লেশমাত্র নেই। বরং বিদ্যার চেয়ে অর্থের কদর বেশি। যুগে যুগে তা'ই তো হয়ে এসেছে। ধন তখন অকাতরে ব্যয় হত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, আর বিদ্বানেরা অক্লেশে মাথা বিকিয়ে দিতেন বিদ্যাধরীদের পায়ের তলায়। আকণ্ঠ মদে চুর হয়ে মাতলামি করলেই বা কী! সমাজের তেমন কোনও মানদণ্ড কেউ নির্ধারণ করেননি তো। গণিকালয়ে যাতায়াত নিয়েও তেমন সমালোচনার সম্ভাবনা ছিল না। এই তো রীতি, এমনটিই তো অতি স্বাভাবিক। অশিক্ষা আর অপশাসন, কুসংস্কার আর অপদার্থতা সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ইংরেজ শাসনের এই সময়কালে সমস্ত বাংলাদেশ ভেসে যাচ্ছে অপচয় আর অবক্ষয়ে। বাবু সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন সমাজ। বরিশাল শহরে নামজাদা বড় উকিল মানেই তিনি কাছারি যাবেন পালকিতে চড়ে, সঙ্গে থাকবে অনুগত ভৃত্য। সে ভৃত্য বয়ে নিয়ে যাবে মালিকের হুঁকো আর ছাতা। যত্রতত্র প্রভুর তামাক সেবনের সুবিধা আর ঝড়-জল-রোদ থেকে মালিকের মাথা বাঁচানোর জন্য একটি ছাতাধারী সেবক – এ'দুটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরিতে বসে উকিলেরা নিজেদের মধ্যে অশ্রাব্য কুৎসিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগেই তখন বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের আন্দোলন তখনও খাল-বিল-নালা পেরিয়ে বরিশালে দানা বাঁধা দূরস্থান, তেমন রেখাপাত করেনি।

অশ্বিনীকুমার দত্ত সর্বপ্রথম এই দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ।

তিনি যখন বরিশালে আসেন, তখনকার উকিলদের মধ্যে প্যারীলাল রায় ছিলেন সবথেকে তীক্ষ্ণধী ও তেজস্বী। তিনিই বরিশালের প্রথম ব্যারিস্টার। লাকুটিয়ার রাখালবাবু তাঁর বড়ভাই, বার অ্যাট ল' হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার প্যারীলাল দাদাদের পথ অনুসরণ করে নিজেও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনিই কখনও কখনও সরকারি কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করতেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন, দুর্নীতি নিয়ে সরব হতেন। অশ্বিনীকুমারের কথাবার্তা চালচলনে তিনি আগ্রহী হয়ে একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন বরিশাল শহরে নিজের বহির্বাটীতে।

নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢোকেন যে সৌম্যকান্তি দৃপ্ত যুবক, তার চোখেমুখে সূর্যের দীপ্তি।

“আমিই অশ্বিনী। আপনে আমারে আইতে কইসিলেন।”

“হ। তোমার লগে আলাপ করনের বড় ইচ্ছা ... খাড়ায়্যা রইলা ক্যান,” প্যারীলাল বসতে ইশারা করেন যুবককে। তিনি বসতে আদেশ না করলে বয়সে ছোট যুবক নিজে থেকে আসন গ্রহণ করতে পারেন না। নব্য যুগের উচ্চশিক্ষিত যুবক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই সহবতটুকু লক্ষ্য করে মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হলেন প্যারীলাল।

“শুনলাম কলকাতায় তুমি স্বয়ং পরমহংসের সাক্ষাৎ পাইস' ...”

প্যারীলালের প্রশ্নে কৌতূহল আর আগ্রহ। উকিলি জেরা নয়, সস্নেহ জিজ্ঞাসা।

“ঠিকই শোনসেন। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দ্যাখা কইরা আইলাম। কেশব সেনও আইসিল সেদিন। অ্যাকলগেই দ্যাখা হইল।”

কলকাতায় উচ্চশিক্ষার সুবাদে প্যারীলাল আর আশ্বিনী দু’জনেরই কথাবার্তায় বরিশালিয়া অপভ্রংশের প্রভাব অনেক কম। তাঁদের কথাবার্তায় ঢাকা শহর এবং খানিকটা কলকাতার মান্য বাংলার প্রভাব তুলনামূলক অনেক বেশি। প্যারীলাল জিজ্ঞাসা করেন, “তা’ ক্যামন বুজলা তারে ? অনেকরকম কথা শুনি ওই রামকৃষ্ণরে লইয়া। সইত্য মিথ্যা জিগামু আর কারে। তোমারেই বরং জিগাই।”

“আমার পিতাঠাকুরও তাঁর লগে দ্যাখা করেন একবার। তাঁর মুখেই শুনসি ক্যামনে কথা কইতে কইতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন এই মানুষটা। আপনে আমারে কইতে পারেন, অবিশ্বাস লইয়া তুমি তার কাসে গ্যালা ক্যান। ঠিক তা’ নয়। আমি কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মূল কথায় আর তাঁর মুখের কথায় প্রভেদ পাইলাম না কোনও ...”

“হেয়া কি কও অশ্বিনী !” আশ্চর্য হয়ে বলেন প্যারীলাল।

“ঠিকই কই।” অশ্বিনী মনে মনে উচ্চারণ করে নেন, ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য ঈশ্বর এক ও চিন্ময়। তিনি অনন্ত, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বব্যাপী। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্তা, বিধাতা। তিনি জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়।

প্যারীলাল সামান্য অধৈর্য, “তিনি, মানে রামকৃষ্ণ তো শুনসি কালীর ভক্ত ... দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী ... সাকার মূর্তিপূজায় তাঁর বরাবরের আস্থা ...”

“তা হইলেই বা ... বেদ যারে পরমব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁরেই কালী ক’ন। মুসলমান তারে আল্লা কয়, খ্রিস্টান যারে গড নাম দেয়, তিনি তাঁরেই ক’ন কালী। তিনি অনেক ঈশ্বর দ্যাহেন না। আমরা যাঁরে ব্রহ্ম বলি, যোগী যাঁরে আত্মা নাম দেন, ভক্ত যাঁরে ভগবান বইল্যা ডাকেন, পরমহংসদেব তাঁরেই কালী কইলেন।”

“উনি কি এইভাবেই কইলেন অশ্বিনী ?”

“উনি আশ্চর্য ভাষায় কইলেন জানেন ... উনি কইলেন ... ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে, হিন্দুরা রংপরং তুলে নিচ্ছে। জল আর বরফ – নিরাকার আর সাকার। যা জল, তাই ঠাণ্ডায় বরফ। জ্ঞানের গর্মিতে বরফ গলে জল হয় আর ভক্তির হিমে জল হয় বরফ।” শ্রীরামকৃষ্ণের জবানিতে তাঁর কথা বলতে বলতে চোখমুখ মেদুর হয়ে আসে অশ্বিনীর।

“তাঁর সেই গভীরতা আর বালকস্বভাব ... স্বচক্ষে না দ্যাখলে বিশ্বাসই হয় না ... সর্বদাই যেন যোগেতে আছেন। এত শান্ত, এত কোমল ... কতক্ষণ বইস্যা রইলাম ... আসতে মন লাগে না।”

রামকৃষ্ণকে নিয়ে কথা বলতে বলতে অশ্বিনীর বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। কী এক অনাবিল পবিত্র মায়া জড়ানো ওই মানুষটির চারপাশে। এক দিব্য ছটা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। ভাবগম্ভীর অথচ শিশুর মতো সরল। কারও কথায় এই হেসে উঠছেন খিলখিল করে, এই আবার কচি খোকার মতো কেঁদে ভাসাচ্ছেন। অপূর্ব সহজ ভাষ্যে বুনে চলেছেন কত গভীর কঠিন গম্ভীর কথা। এত সহজে এত জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে বলা বড় সহজ কাজ নয়।

প্যারীলাল জিজ্ঞাসা করেন, “কেশববাবু নাকি প্রায়ই যান তাঁর কাছে ?”

দুঁদে আইনব্যবসায়ী প্যারীলালের কথার ভাঁজে লুকিয়ে থাকা সংশয় প্রখর বুদ্ধিমান অশ্বিনীর কানে ধরা পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় মানুষ যখন মূর্তিপূজকের সান্নিধ্যে বারবার যান, তাঁর গতিবিধির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই।

অশ্বিনী স্পষ্ট দু'চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকান প্যারীলালের দিকে।

"দক্ষিণেশ্বরের এক সাধু, অশিক্ষিত সাধুই কই তাঁরে, কদ্দূর আর প্রথাগত ল্যাখাপড়া করসেন, ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা তার নাই মানত্যাসি ... তিনি কী কইলেন জানেন ? তিনি কইলেন, যে মানুষ একটারে ঠিক জানে, সে আর একটারেও জানতে পারে। যে নিরাকার জানতে পারে, তার পক্ষে সাকার জানাও সম্ভব। যে কিনা কোনও পাড়াতেই ঘুইর‍্যা বেড়াইল না, সে পাড়াটিরে ভালো কইরা চিনবে ক্যামনে ? বরং সকলে তো নিরাকার পূজায় স্বস্তি পায় না, তাগো লিগ্যা সাকার পূজারও বিশেষ প্রয়োজন আসে বইকি। কী অপূর্ব কনলেন তিনি ... কইলেন, ধরা যাক, এক মায়ের পাঁচ পোলা। মাছ রান্ধনের সময় মা এক এক পোলার লিগ্যা এক এক রকম ব্যঞ্জন রান্ধেন। যার পেটে যা সয়। সেইরকমই, কারও সাকার, কারও নিরাকার। কেউ মূর্তি গড়ে, কেউ ব্রহ্মরে খুঁইজ্যা বেড়ায়।"

বিস্মিত হলেন প্যারীলাল। অশ্বিনী তাঁর জ্ঞান বিদ্যা বিচার বুদ্ধি দিয়ে ইতিমধ্যেই অনুধাবন করেছেন ধর্মের বহুধাবিস্তৃত পথ। প্রথম সাক্ষাতে এই নবীন যুবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পেল।

"ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে গিয়াও হইলা না ক্যান অশ্বিনী ?"

হা হা করে হাসেন নবীন যুবক।

বি এ পাশ করার পর পিতা ব্রজমোহনের কাছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অশ্বিনী। ব্রজমোহন তখন কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ। এর আগে ছোটলাট নিজে স্বয়ং উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে অশ্বিনীকুমারকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নিজেই ততদিনে ইংরেজের গোলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজের কৃতী জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডেকে বললেন, উকিল হও। স্বাধীন ব্যবসা করো। আমি উচ্চপদের রাজকর্মচারী ঠিকই। মাসান্তে হাজার টাকা বেতন পাই। বহু কর্মচারী নির্বিবাদে আমার হুকুম তামিল করে। সমাজেও আমার সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু কম নেই। তবুও আমার বংশে আর কেউ এই গোলামির কাজ বেছে নেবে, এ আমি একেবারেই চাই না।

প্যারীলালের কাছে অশ্বিনী সম্পূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত বিবৃত করে বলেন, "আমারও আর ডেপুটি হওয়া হইল না।" প্যারীলাল মৃদু হাসেন। "যতদূর তোমারে চিনি, ওই ডেপুটিগিরি তোমার মনের মতো কাজ হইতেই পারত না। লাঞ্ছনা ভোগ কইরা ফিরতে হইত। তার চাইতে ভালোই হইল। জীবনের কয়েক বৎসর অন্তত বৃথা অশান্তিতে কাটাইতে হইল না ... আর চাতরার ইস্কুলে হেডমাস্টার হইয়া কেমন কাটাইলা শুনি ..."

অশ্বিনী তখন সদ্য বি এ পাশ করেছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার আশা ত্যাগ করে তখন তিনি শ্রীরামপুরের চাতরায় একটি ছোট ইস্কুলে হেডমাস্টারের দায়িত্ব নেন। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ছাত্ররা দেখল, এ এক নতুন ধরনের হেডমাস্টার। সে বকে না, বেত দিয়ে মারে না, কথায় কথায় ধমকায় না, ভুরু কুঁচকে ভয় দেখায় না, দিব্যি সৌম্যকান্তি যেন এক প্রায় সমবয়স্ক মানুষ। সে ছেলেদের সঙ্গে বেড়ায়, নৌকা করে সন্ধ্যায় নদীতে বাইচ খেলতে যায়, ছেলেরা আবার তার কোলে মাথা রেখে গানও গায়! এ কেমনধারা কাণ্ড! পুরনোপন্থী অভিভাবকদের তো মাথায় হাত। দেশটা যে রসাতলে যাবে এবার। একজন এসে সরাসরি হেডমাস্টারকেই তেড়ে বলে, "বলি মশাই, এসব কী ভালো কাজ হচ্ছে ?"

"কোন কাজ ?" সদ্য যুবক হেডমাস্টারের সরল প্রশ্ন।

"এই যে ছেলেরা আপনার সামনে গান গায়, খেলে বেড়ায়, হাসিতামাশা করে, এগুলি কী ঠিক কাজ ? একজন শিক্ষক হয়ে ছাত্রের নৈতিক আদর্শের কথা ভাববেন না ?"

অশ্বিনী ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠেন।

প্রশ্নকর্তা অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের তুলনায় বয়সে ঢের বড়, ভারিক্কি মেজাজ, তা' সত্ত্বেও ইস্কুলের ছোকরা হেডমাস্টারের অনাবিল হাসির সারল্যস্রোতে তাঁর যুক্তিবুদ্ধি ভেসে যায়। অশ্বিনী হাসতে হাসতেই বলেন, "কেন মশায়, গান গাওয়া তো কোনও মন্দ বা গর্হিত কাজ নয়। স্বাভাবিক বিশুদ্ধ আনন্দের পথ বন্ধ করে দেব কেন ? ওরা যে সকলে আমার কাছে ভগবানের প্রার্থনা গান করে। সে কি সত্যিই কোনও মারাত্মক অপরাধ ? যদি অপরাধ হয়, তবে সেই অপরাধের প্রাপ্য শাস্তি বিধানের দায়িত্ব বরং আপনিই নিন।"

যিনি অভিযোগ করেছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে চলে গেলেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল নতুন হেডমাস্টারের আগমনে ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন জীবনস্পন্দন তৈরি হয়েছে।

প্যারীলাল আড্ডায় মশগুল হয়ে পড়েন। অশ্বিনীর কথায় মাধুর্য আর যুক্তির ভারসাম্য অপূর্ব। সুবক্তার সমস্ত গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে। সেইসঙ্গে রয়েছে দৃঢ়চেতা স্বভাব। স্বাজাত্যাভিমানও তার মধ্যে প্রবল। তাঁর দূরদর্শিতা বলে, বরিশালের পরম ভাগ্য এইরকম একটি রত্নের উদিত হয়েছে। আইনব্যবসায়ে এর কৃতিত্ব কতদূর থাকবে বলা শক্ত, তবে জননায়ক হয়ে ওঠার মতো উপাদান তার মধ্যে ভরপুর।

এখন প্রয়োজন শুধু আহুতির। তবেই এ স্ফুলিঙ্গ দাবানল তৈরি করতে পারে।

(১৪)

বিধুভূষণের ডায়েরিটি ইমন কাছছাড়া করে না। ডায়েরির পাতায় পাতায় নানান রকম নোট নেওয়া। ঠিক দিনলিপি নয়। কখনও একটানা এলোমেলো কথা। মনে রাখার মতো ঘটনা বা উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য। সব তথ্য দিয়ে ইতিহাসের পাঠ্যবই হয় না। কিছু তথ্য মানুষের গড়ে ওঠার দলিল, বেঁচে থাকার রসদ। ইমনের কাছে এই ডায়েরি অনেকটা সেই রকম। এর মধ্যে টুকরো টুকরো সময়। মোজেইকের মতো। কিছু সাদা-কালো, কিছু রঙিন মুহূর্ত। বর্ণময় দিনলিপি হয়ত নয়, আবার তথ্যভারাক্রান্ত নয়। পুরোটাই সিপিয়া টোনে তথ্যচিত্রের মতো আঁকা।

কীর্তনখোলা নদীর ধার থেকে ঘুরে এসে ইস্তক ইমনের গা ম্যাজ ম্যাজ। দুপুরে খেয়েদেয়ে সদর গার্লস ইস্কুল আর বনমালী গাঙ্গুলীর বসতবাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা। সেটিতে এখন সদর গার্লস ইস্কুলের আবাসিক মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা। অনেকের মুখেই ইতিপূর্বে শোনা, এবার চোখে দেখা হবে। যে কারণে ছুটে আসা কাঁটাতার পেরিয়ে।

শুধুই কি বনমালী গাঙ্গুলীর সেই বসতবাড়ি দেখতে ছুটে আসা ?

দুপুরের খাবারের পাতে চিংড়ি আর ইলিশের যৌথ অবস্থান। বিরাট কাঁসার থালার পাশে থরে থরে বাটিতে সব সাজানো দেখে ইমনের প্রথমে হাসিই পেয়ে গেল। পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজন আছেই। বড় বাটিতে ট্যাংরা আর পারশে মাছও রয়েছে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মামীমার জোরালো গলায় আদেশ, "সব কিন্তু খাইতে হইব, এই কইয়া দিলাম।"

ইমন আঁতকে ওঠে।

"জাস্ট মরে যাব মামীমা। এখান থেকে সিধে শ্মশান।"

"আরে আরে এ ছেমড়ি কয় কী !" মামীমা চেঁচিয়ে ওঠেন, "তোমাগো মুখে দেহি কিছুই ঠ্যাকে না। খাইতে বইস্যা হেয়া কী হাজিবাজি কথা ... খাও দেহি বইস্যা। বাংলাদ্যাশের গল্প শুইন্যা খাইতে বইলে দ্যাখবা ওই দু'গা ভাত শ্যাষ হইতে কতক্ষণ !"

মামীমা বরিশালের মানুষ নন। তাঁর কথায় সমস্ত বাংলাদেশ মিলেমিশে যায়। অবশ্য অমরমামা নিজেও এখন আর খাঁটি বরিশালিয়া ভাষা বলেন কোথায় ? কীর্তনখোলার জলে অনেক বন্দরের জাহাজ ভেড়ে। তাদের কালিঝুলি রঙ রস সবই

তো আসে যায়। জলে দ্রবীভূত হয় কত কী। ডুবে থাকে ভারী বস্তু। ভেসে যায় কিছু বাঁধনছাড়া শিকড়হীন হয়ে। মানুষের মনও তেমনই। কিছু থিতিয়ে পড়ে, কিছু ভেসে ওঠে।

সকালে নদীর হাওয়ায় রোদে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে শরীর ভালো লাগছে না, মামীমাকে এ'কথা একেবারে বলতে ইচ্ছে করে না। খামোখা তিনি ব্যস্ত হবেন। বেড়াতে এসে তাঁদের অহেতুক অস্বস্তিতে ফেলা। কী দরকার ? ইমন ঠিক করল, খেয়ে উঠে চুপচাপ একটা ওষুধ খেয়ে নেবে।

ওষুধের কথা মনে পড়তেই পুরনো এক কাহিনির গোঁজ তৈরি হয় মাথার মধ্যে। এক সুতোয় বাঁধা কিছু শব্দ, একটিতে টান পড়লে আরও কয়েকটি শব্দ চলে আসে পরপর। একটি ঘটনার পিছু পিছু আরও অনেক ঘটনা।

শোনা যাচ্ছে একটু একটু করে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ছে শহরে। গ্রামের সব খবর শহরে এসে পৌঁছয় না সবসময়। তবে এই রোগ যে কালান্তক মহামারীর আকার নেবে, সে আশঙ্কা আর সকলের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল না হলেও বনমালী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন ক্রমশ। এ রোগের উৎপত্তি বহু কালের, প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসেও এই রোগের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগে ভারতে-ভারতের বাইরে বহু জনপদ ছারখার হয়ে গিয়েছে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে। ইঁদুর থেকে ইঁদুরে, ইঁদুর থেকে মানুষে ... শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় মানুষ থেকে মানুষে। ফলাফল একটাই। মৃত্যু।

ওষুধ আর কোথায় ? সব অসুখের ওষুধ হয় না। এখনও সভ্যতা অতদূর সাবালক হয়নি। মানুষ প্রাণভয়ে স্থানত্যাগ করে শুধু। ছেড়ে চলে যায় বাসস্থান, আত্মীয়-পরিজন, ঘরবাড়ি। মৃত্যুভয়ে, বাঁচার জৈব তাগিদে অক্লেশে ত্যাগ করে প্রিয় পরিজন।

এক সময় অবধি অনেকেই বিশ্বাস করত প্লেগ সিন্ধু নদের পূর্বদিকে এসে পৌঁছবে না কোনওদিন। তার যত অত্যাচার, সেসব ওই সাহেবসুবোদের দেশে। কিন্তু উনিশ শতকে প্লেগ সব হিসেব গোলমাল করে দিয়েছে। ভারতের উত্তরে পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে একটু একটু করে বেশ কয়েকবার থাবা বসিয়েছে সে। এতদিনে সে নিঃশব্দে এসে ঢুকল বাংলাদেশে।

বিধুভূষণের ডায়েরি অনুযায়ী ডাক্তার বনমালী গাঙ্গুলীর স্ত্রী রওনা হয়েছেন গৈলা-ফুল্লশ্রী; তাঁর পিতৃগৃহে। তাঁর সহোদরা প্লেগে আক্রান্ত। তার শিশুপুত্রটির কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে। সদ্য সন্তানহারা মা এবং তার শ্বশুরগৃহে বেশ কয়েকজন নাকি মরণাপন্ন অবস্থা। তার মধ্যে সুহাসিনীর বড় জা হেমাঙ্গিনীও রয়েছেন। সুহাসিনীর অসুস্থতার খবর এসেছে শহরে, চিকিৎসক ভগ্নীপতির কাছে। বনমালী অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়েন। কুটুমবাড়ি বলে কথা। তার ওপর বিনোদিনীর পরোপকার নিয়ে কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই, সকলেই তাঁর ওপর নির্ভরশীল; যেখানে যার যা হয়, তিনি নিশঙ্কচিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোগীকে উপযুক্ত পথ্য যত্ন সেবা দিয়ে অসুস্থকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তবে তাঁর শান্তি। আজ অবধি এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি। এইসব ব্যাপারে কারও কোনও শাসন বা বারণ তিনি কখনও শুনেছেন বলে জানা যায়নি। বনমালী জানেন, তাঁকে আপত্তি করা নিরর্থক।

একজন চিকিৎসক হয়ে এমন একজন সেবাপরায়ণা মানুষকে বাধা দিতেও তাঁর মন চায় না। কিন্তু অসুখটা যদি সত্যিই প্লেগ হয়ে থাকে, তবে তার প্রাদুর্ভাব নিয়ে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বইকি। পরিবারের কর্ত্রী প্লেগের রোগীকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে নিজেই আক্রান্ত হতে পারেন। এই সম্ভাবনা বনমালীর মাথায় চেপে বসলেও স্ত্রীর সামনে তিনি তাঁর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন না। চিঠিতে রোগের লক্ষণ সম্পর্কে পড়ে তাঁর ক্ষীণ ধারণা, বিনোদিনীর বোন সুহাসিনী হয়ত প্লেগে আক্রান্ত নন।

বিনোদিনী রওনা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বনমালী এসে দাঁড়ান।

"নৌকা আইয়্যা পড়সে।"

বিনোদিনী তাকান একবার। ধীময়ী এই নারী জানেন, বিনা কারণে বনমালী এসে অন্দরমহলে দাঁড়াননি। তাঁর কোনও বক্তব্য নিশ্চয়ই রয়েছে। সেটি অনুধাবন না করে পিতৃগৃহে গিয়ে তিনি কোনওভাবেই স্বস্তি পাবেন না।

"প্রথম কাইজ হইল, গিয়াই তোমার বুইনের শরীরের সমস্ত লক্ষণ, কষ্ট, খাওনের ইচ্ছা আসে কিনা, কোথায় কী ব্যথা-ব্যাদনা সব আমারে লিখ্যা পাঠাইবা। শিবে নৌকা লইয়া থাকব অইহানে দুই দিন। অর হাত দিয়ে আমারে পত্র পাঠাইলে আমি রোগ নির্ণয় কইরা কইয়া দিমু সব ... মনে রাইখ্যো, প্লেগ কিন্তু ছোঁয়াছানি থিক্যা ভয়ঙ্কর হইতে পারে ... এই রোগ কারেও ছাড়ে না। খাইয়্যা ফ্যালায় অ্যাক্কেরে ...।"

"চিন্তা কইরো না। আমি সব লিখ্যা পাঠামু অনে। আমার মন কয়, প্লেগ হয় নাই। তবু যাওন আমার কর্তব্য। গিয়া দেহি আগে ... তুমি ফুটুরে দেইখ্যো। বড় দুষ্টামি করে।"

গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করেন বিনোদিনী।

"নয়াবউ, সর্বদা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ কইরো।"

বনমালীর কথায় বিস্মিত হন না বিনোদিনী। শিবের উপাসক মানুষটি তাঁর পেশাগত জীবনেও প্রতি মুহূর্তে মহাদেবকে স্মরণ করে সমস্ত কাজ আরম্ভ করেন। বিনোদিনী দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকান একবার। আত্মবিশ্বাস আর ঈশ্বরবিশ্বাসের সঠিক ভারসাম্য থাকলে যে কোনও কার্যোদ্ধার সহজতর হয়। এই আস্থা নিয়েই এঁদের এগিয়ে চলা।

বিধুভূষণের ডায়েরিতেও সেই সময়ের কথা।

"বিনোদিনী দেবী আগামীকাল রওনা দিবেন বলিয়া শোনা গেল। প্রতিদিনের মতো আজিও তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন দ্বারপ্রান্তে। যে সময় আমরা আহার্য গ্রহণ করি, তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন সকলে তৃপ্তি করিয়া খাইল কিনা। যে ভৃত্যটি পরিবেশন করিতেছিল, সে দ্বিতীয়বার ভাত লইয়া আসিয়া প্রত্যেকের পাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢালিয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে কহিল, কাইল থিক্যা আর মা-ঠাইরন আইয়া খাড়াইবেন না, যা লাগে আমাগো কাসে চাইয়া খাইয়েন। আমরা বুঝিলাম, আগামী কয়েক দিবস গৃহকর্ত্রীর কৃপা ও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইব। আহার্যের পরিমাণ বা মান লইয়া আমরা চিন্তিত হই নাই। এই গৃহে সকল কিছুই এক আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতায় পালিত হয়। কিন্তু তিনি যে প্লেগ-আক্রান্ত সহোদরার শয্যাপার্শ্বে অক্লান্ত সেবাযত্নে নিয়োজিত থাকিবেন, তাহা অগোচর ছিল। সেই সংবাদ পাইলাম কয়েক দিবস গত হইবার পর।

গৃহকর্ত্রী অনুপস্থিত থাকিলে গৃহে সামান্য হইলেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিনোদিনী দেবীর কড়া দৃষ্টি এবং নির্দেশাবলী বিদ্যমান থাকিলেও ভৃত্যগণ দায়িত্বপালনে অনীহা প্রকাশ করে। বিশেষত গৃহের সর্বাপেক্ষা চঞ্চল সদস্যটি ইত্যবসরে তাহার যাবতীয় দুষ্কর্মের পরিকল্পনা করিয়া সেগুলি একে একে নিষ্পন্ন করিতে থাকে।"

বিধুভূষণের সঙ্গে এইসময় আলাপ বনমালী গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের। তার ডাকনাম ফুটু। বাড়ির একপাশের সীমানা-ঘেঁষা দিকের যে ঘরগুলিতে ছাত্ররা থাকত, সেই ঘরে তার প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। শুধু তার নয়, পরিবারের কেউই এই ঘরগুলিতে আসাযাওয়া করতেন না। ছাত্ররা ভৃত্যের মুখে খবর পেয়ে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে খাবার আগে সারি বেঁধে গিয়ে বসত দালানে। খেয়েদেয়ে আবার অন্দর থেকে তাদের নির্দিষ্ট ঘরে চলে আসা। এই ছিল অলিখিত নিয়ম। বিনোদিনীর অনুপস্থিতিতে এই নিয়ম প্রথম ভাঙল এক দুরন্ত কিশোর।

বিধুভূষণের বই পড়ার অভ্যাস বরাবরের। বিধুভূষণ বি এম ইস্কুল থেকে এবার ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে জলপানি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। জলপানি না পেলে কলেজে ভর্তি হওয়ার আশা নেই। বাপ-মায়ের এগারোটি পুত্র-কন্যার মধ্যে অষ্টম গর্ভের বিধুভূষণের উচ্চশিক্ষা নিয়ে সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে পরীক্ষার ফল ভালো না হলে। বাবা অর্থ জোগাবেন না। তার

ওপর বরিশালে এসে ইস্তক তার ব্রাহ্মধর্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। এসব সংবাদ গ্রামে পৌঁছলে ঠাকুর্দা নির্ঘাত ত্যাজ্য করবেন। ঠাকুমা গোবর খাইয়ে নাতিকে ঘরে না তুললে মায়ের অন্নজল ত্যাগ করার প্রভূত সম্ভাবনা। এগারোটি সন্তানের মধ্যে কী এক অজ্ঞাত কারণে বিধুভূষণ মায়ের আর ঠাকুমার বেশি আদরের।

অথচ তাকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে হল। বাকিরা দিব্যি গ্রামের ইস্কুলে পড়ার পরে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেউ চাষের কাজ দেখে। কেউ ছোটখাটো বাগান-গোয়াল। অধিকাংশ সময়ই তাদের কাটে শুয়েবসে আলসেমি করে। বরিশালের যেমন চিরন্তন স্বভাব। একজনে আয় করে, বাকিরা খায়। সকলের উঠে দাঁড়িয়ে খেটেখুটে রোজগার করার ইচ্ছেটুকুই নেই।

বিধুভূষণের বাবা অবশ্য বলেন, অগো মাথা নাই। বিধুর মাথা ভালো, অরে পড়াইতে হইব। কিন্তু পড়ানোর খরচ তিনি সব জুগিয়ে উঠতে পারবেন না। গ্রামসম্পর্কে এক জ্ঞাতি আত্মীয়ের একটি চিঠি ভরসা। তিনি বরিশাল শহরে ডাক্তার বনমালী গাঙ্গুলীকে লিখে পাঠান, "একটি মেধাবী ছাত্র আপনার গৃহে থাকিয়া পড়াশোনা করিতে চায়। আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহাকে স্থান দিয়া ..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিধুভূষণ একটি টিনের ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে আসে শহরে।

একেই বলে নিয়তি।

বরিশাল শহরটি তার কাছে একেবারে নতুন এক জগৎ। এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাধীনতার আস্বাদ যেন। শহরে লাল সুরকির রাস্তা। লাল ফিতের মতো একের পর এক আঁকাবাঁকা পথ পেঁচিয়ে আছে সমস্ত শহরটিকে। পথের দু'ধারে সর্বত্রই যে বাড়িঘর রয়েছে, এমনটা নয়। কোথাও একদিকে বাড়ি। অন্যদিকে বিরাট পুকুর। সামান্য চওড়া খাল আর নালা ছড়িয়েছিটিয়ে শহর জুড়ে। নালার জলে গজিয়ে উঠেছে ঘন বেতবন। তার তলায় উঁকি দিলেই দেখা যায় গাঢ় সবুজ কচুরিপানা। কত রকমের সবুজ চারদিকে ... কচুবন, আকন্দ, ডুমুর ... নালার ধারে ধারে ঢেঁকিশাক, হিঞ্চে আর থানকুনির জড়াজড়ি ভিড়।

সপ্তাহে একদিন মায়ের আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি আসে। বাবা আর বড় ভাই খোঁজখবর নেন নিয়মিত। এই চিঠিগুলি থাকে পড়ার বইয়ের মধ্যে, তক্তপোষের ওপরেই। চিঠির অক্ষরে ঝালকাঠি গ্রামের গন্ধ, মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ আর ঠাকুমার আঁচলের নরম স্পর্শ।

ফুটু এই ঘরে এসে দৌরাত্মি শুরু করল।

বিধুভূষণ ছাড়াও এই ঘরে থাকে অনাদি আর শিবশঙ্কর। ব্রাহ্মসমাজে এদের সঙ্গেই যাতায়াত করে বিধুভূষণ। বয়সে সামান্য বড় এরা দুজন। বিধুভূষণকে সুহৃদের মতোই দেখে। তারা ঘরে থাকে কম। অধিকাংশ সময়ে তারা ব্রাহ্ম সমাজের কার্যালয়ে সময় কাটায়। তাদের প্রচুর বইপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে ঘরের মধ্যে। বিধুভূষণ সেগুলি মন দিয়ে পড়ে। কিছু বোঝে। কিছু অবোধ্য থেকে যায়। গভীর রাতের আলোচনায় কোনও কোনও দিন উঠে আসে ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ, আসে অশ্বিনী দত্তের তৈরি 'পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যকলাপ।

অনাদি ব্যারিস্টার স্বরূপ গুহর বাড়িতে নিয়মিত যায়। অর্থাভাবে তার ওকালতি পড়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু ওকালতির পেশায় কোনও না কোনওভাবে সে যুক্ত হতে চায় প্রাণপণ। দরকার হলে সে আদালতে বসে খসড়া বা মুসাবিদা করার কাজে করণিক হিসেবেও যোগ দেবে। সেজন্য ব্যারিস্টারের বাড়িতে অনেক কেস নিয়ে আলোচনার সময় সে উপস্থিত থাকে। নিয়মিত বরিশাল কোর্টে সওয়াল-জবাব শোনে। আর অভিজ্ঞ মুহুরীদের কাছে সব নিয়মকানুন শিখে নেবার চেষ্টা করে। প্রতিদিনই তার ঘরে ফিরতে অনেক রাত হয়। সেজন্য অধিকাংশ দিন ঠিকঠাক খাওয়া হয় না। আর সময়মতো না খেলে তার মেজাজ হয়ে থাকে তিরিক্ষি।

রাতে খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে শিবশঙ্কর প্রথম লক্ষ্য করে, তার তক্তপোষের ওপর রেখে যাওয়া রজনীকান্ত গুপ্তের লেখা ‘সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস’ বইটির বেশ কিছু পাতা মুচড়ে ছেঁড়া। চট করে মাথা গরম হয়ে যায় শিবশঙ্করের।

“বিধু, এদিগে আয়।”

“হইলডা কী ? অসন মন্তর ...”

“দ্যাখ আইস্যা ... বইখান ধরসে ক্যাডা কইতে পারো ?”

বিধু দেখে বইটির মাঝখান থেকে বেশ কিছু পাতা এলোমেলোভাবে ছেঁড়া।

“হেয়া করল ক্যাডা ?”

“হেয়া তো আমিও জিগাই। করল ক্যাডা ? বইয়ের এমন হাল ! কোন বোগদা ছ্যামড়ার কাম ...”

অনাদি তখনও ফেরেনি। শিবশঙ্কর বিধুকে খানিক নরম-গরম শোনাবে ভাবে। কিন্তু কী ভেবে থেমেও যায়। কী লাভ এই ছোঁড়াকে বকে ? এও তো অধিকাংশ সময় থাকে তার নিজের পড়াশুনোর তালে। আর যতদিন ধরে একসঙ্গে আছে, বিধুর মধ্যে কোনওরকম বেচাল দেখেনি শিবশঙ্কর। বই ছেঁড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে বইয়ের যত্নই করে। গত বেশ কয়েকবার নিজে উদ্যোগী হয়ে ছেঁড়াখোঁড়া বই গুণসূঁচ দিয়ে সেলাই করে দিব্যি নতুনের মতো হাল ফিরিয়ে দিয়েছে বিধু।

খানিক বাদে নরম স্বরে বলে, “কিছু ক’স না যে বড় ?”

বিধু তাকায়, একটু হাসে। “কী আর ক’মু। তুমিও যেহানে, আমিও সেইহানে। কোন ছ্যামড়া এই উদ্দণ্ডপানা করসে ট্যার পাইলে ...।”

সেই ছ্যামড়ার আরও কিছু ‘উদ্দণ্ডপানা’ দুয়েকদিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। অপরাধী তার অন্যায় কাজে প্রতিরোধ না পেলে আরও সাহস সঞ্চয় করে। ক্রমশ তার নিত্যনতুন অপরাধের কৌশল আবিষ্কার করতে সাধ হয়। এ’ও এক আনন্দ বইকি। বিনোদিনীর অনুপস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য অনাদি শিবশঙ্কর আর বিধুভূষণের ঘরটিই তার কেন পছন্দ হল, সে কারণ সম্ভবত বিধাতারও অজানা। নির্জন দুপুরে অনাদির নতুন কাচা পিরানটায় ফুটু খুব মনোযোগ সহকারে পুকুর থেকে তুলে আনা নরম মাটি লেপে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। চোখের নিমেষে কীর্তিকলাপ সমাপ্ত করে অকুস্থল ছেড়ে পালানোতেই তার দক্ষতা বরাবর অত্যন্ত বেশি। কিন্তু হঠাৎ কী এক অজ্ঞাত কারণে এক নির্জন নিঝুম নিরালা দুপুরে বাড়ির পিছনের পুকুরপাড় থেকে কাদামাটি তুলে এনে তার এক অপূর্ব শিল্পকর্মে মনোযোগ দিতে ইচ্ছে করল। শুধু মনোযোগ বললে ভুল বলা হবে। সে এক অখণ্ড মনোযোগ। সেই মনোনিবেশের তীব্রতায়, মৃৎশিল্পীর নিপুণতায় সে চিত্রিত করছিল অনাদির সাদা পিরানটি। সে মনে মনে কল্পনা করে, সাদা হাতওলা পিরানটির সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। সেই ভিজে মাটি অচিরেই শুকিয়ে উঠবে। পোশাকটি নিশ্চিতভাবেই অভিনব হয়ে উঠবে। অনাদির পোশাকটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কল্পনা করে ফুটুর মুখে যখন বেশ একটি নির্মল হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, সেই মুহূর্তেই অবনী কাছারি থেকে ঘরে এসে উপস্থিত হয়। দূর থেকে তার ক্লান্ত পায়ের চলনের শব্দ সম্ভবত ফুটুর গভীর মনোযোগ ভঙ্গ করে তাকে সতর্ক করতে পারেনি। অস্নাত অভুক্ত অবনী ভরদুপুরে ঘরে ফিরে নিজের হাতে কাচা পিরানটির ওই সযত্নে চর্চিত শিল্পকর্ম দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

চেতিয়ে উঠে অবনীর মুখে কথা সরে না কোনও। অভুক্ত শরীর আর সেইসঙ্গে হাতের নাগালে এইরকম দুঃসাহসী কিশোরের অপূর্ব কর্মকাণ্ড দেখে সে প্রথমে একেবারে হতচকিত হয়ে যায়। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে ক্ষিপ্ত অবনী পিছন থেকে এসে সজোরে এক কিল মারে ফুটুর পিঠে। ফুটু সচকিত হয়ে উঠে পালাতে যেতেই তার হাতের নড়া ধরে প্রচণ্ড এক চড়। শত দুষ্টু হলেও ফুটুর গায়ে কেউ কখনও হাত তোলে না। বনমালী গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠপুত্র বলে কথা। তাকে ডরায় সকলে,

দূর থেকেই যা শাসন আর শাসানি। তা'ও বিনোদিনীর কড়া নির্দেশে কেউই সীমা লঙ্ঘন করে না। বরিশালে এই সংযম বড় কম কথা নয়।

অবনীর এইসব জানার কথা নয়। কে ফুটু, তার সীমারেখা কতদূর, সে কতটা দুরন্ত বা কতটা প্রশ্রয় পায় এই বাড়িতে, এইসব যুক্তিবুদ্ধি তথ্যের উর্ধে তখন অবনী। তার সাধের সাদা পিরানে কাদা লেপে সেটিকে অপূর্ব চিত্রিত করা হয়েছে, এইটুকুই তার রেগে আগুন হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট।

ফুটু তার শরীরের সমস্ত শক্তি এবং ক্ষিপ্রবুদ্ধি প্রয়োগ করে এক নিমেষে হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালায় ঘর থেকে। শুধু যাবার সময় তার জিভ ভেঙিয়ে পালটা কিল দেখিয়ে ছুটে পালানোটি অবনীর মতো মানুষের একেবারে অসহ্য।

সে কেবল ফন্দি আঁটে এই দুরন্ত ছেলেটিকে কেমন করে শাস্তি পাওয়াবে।

কিন্তু ছেলেটি কে ? তাকে তো চেনেই না অবনী।

(১৫)

"হ্যাবোগ্যারে মরণ দহায় পাইসে। দ্যাহা করনের লেইগ্যা যতো চেষ্টাই করি, হেডায় কি দ্যাহা দেয় না হামনে আহে ? ক্যাবল আড়ালে আবডালেই রয়। হ্যার মতিগতি ভালা কইরা বুইজ্জা লই।"

পথে হেঁটে আসতে আসতেই কথাগুলো কানে গেল বিধুভূষণের। ফিক করে একবার হাসে সে। নির্ঘাত কোনও মামলা-মকদ্দমা। আজ সে ইস্কুলের শেষে গিয়েছিল প্রেসে। ছোট্ট ছাপাখানা। অশ্বিনীবাবুর বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইস্কুলের সমস্ত ক্লাসের যাবতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এখানেই ছাপা হয়। গিরিজাবাবু ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি এই ছাপাখানাটির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর সূত্রেই এখানে যোগাযোগ।

সদ্য তৈরি হওয়া বি এম স্কুলের নিয়ম আশ্চর্য। এখানে পরীক্ষার সময় পরীক্ষাহলে কোনও পরিদর্শক থাকেন না। অশ্বিনীবাবু নিজে প্রতিটি ক্লাসে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের বুঝিয়েছেন, পরীক্ষার সময় আলাদা করে পাহারাদারির কোনও প্রয়োজনই নেই। ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের পরিদর্শক। তারা যা পড়ে আসবে, যতটুকু শিখেছে, পড়েছে, জেনেছে, সেটুকুই তারা খাতায় লিখবে। ঘাড় ঘোরাবে না কোনওদিকে, কথা বলবে না কারও সঙ্গে, বইপত্র বের করে দেখার প্রশ্নই নেই। পরীক্ষার সময় তারা ক্লাসে ঢুকবে দোয়াত-কলম নিয়ে, চুপচাপ বসে পরীক্ষা দেবে, তারপর ছুটি। মাস্টারমশাইদের কাজ শুধু খাতার মুল্যায়ণ করা, নম্বর দেওয়া, কেউ কম নম্বর পেলে তাকে ডেকে বিষয়টি আবার বুঝিয়ে দেওয়া। এমনকি অকৃতকার্য ছাত্রদের জন্যেও বি এম ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা ভারি যত্নবান। তাঁরা যে কোনও সময় ছাত্রকে ডেকে নিয়ে যান নিজেদের বাড়িতে। তাকে বারে বারে পড়িয়ে বুঝিয়ে বা নরমে-গরমে গিলিয়ে দেন যে কোনও অজানা, কমজানা বা ভীতিপ্রদ বিষয়। এসব কাজে তাঁরা সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু এই নৈতিকতার পাঠ বড় সহজ কথা নয়।

ছাত্র পরীক্ষাহলে বসে লিখবে, অথচ সেখানে কোনও গার্ড নেই, কেউ তাকে নজরদারি করছে না, সে তো তবে লোভের ফাঁদে পা দেবেই। আগে থেকেই যে জানে তার জন্য কোনও পাহারাদারি নেই, তাহলে তার মনের মধ্যেকার অপরাধী মনটা একটা সুযোগ নিতে চাইবে না ? ফার্স্ট হওয়ার সুযোগ, ক্লাসে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার সুযোগ, পরীক্ষার ফলে কৃতকার্য হওয়ার সুযোগ। জীবনে এমন সুযোগ ক'বার আসে ? দুষ্টুমি করা কিশোর মনের অবচেতনেও যে ঘাপটি মেরে থাকে এইসব কুচো কুচো লোভ। প্রাপ্য আদায় করা, নিজেকে যাচাই করার করার মতো কঠিন কাজের চেয়ে একটি সহজ সরল বাঁকা পথ বেছে নিলেই তো সাফল্য হাতের মুঠোয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রথমেই শিশু মনস্তত্ত্বের একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল জায়গায় হাত রাখলেন।

ওকালতি ছেড়েছেন বেশ কিছুকাল হল। সুবক্তা তিনি। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে ছাত্রসমাজের উন্নতিতে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাঁর জীবনে আদর্শে ক্রমশ অনেকেই উদ্বুদ্ধ। সম্প্রতি ছাত্রদের সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান নামে একটি সংগঠনে তাঁর বক্তব্যে আকৃষ্ট হন অনেকেই। সত্যানন্দ দাস ছিলেন ছাত্রসমাজের সম্পাদক। প্রচারক কালীমোহন দাস আর মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার মতো সুবক্তা বাগ্মী পণ্ডিত মানুষের পাশাপাশি অশ্বিনীবাবুর ভাষণ উদ্দীপিত করে তুলতে লাগল ছাত্রদের।

ছাত্রদের নরম মনে আদর্শবোধ জাগিয়ে তলার উদ্দেশেই প্রথমে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে তৈরি হল একটি ইস্কুল। এবার সেই ইস্কুলে শুধু প্রথাগত আর পুঁথিগত পঠনপাঠন নয়, অশ্বিনী জোর দিলেন ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গানের।

প্রথম পরীক্ষা। ছাত্রকে তার নিজের ক্লাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিজে হাতে করে নিয়ে যেতে হবে প্রেসে। সেই প্রশ্ন ছাপানো হয়ে গেলে আবার সেটি প্রেস থেকে নিয়ে এসে জমা দিতে হবে শিক্ষকের হাতে। এক-একটি বিষয়ের জন্য এক একজন ছাত্র। প্রতি ক্লাসে অন্তত দশজন ছাত্রকে বেছে রাখলেন শিক্ষকরা মিলে। একজন প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবে, আর একজন ছাপানো প্রশ্নপত্র নিয়ে আসবে। একটি বিষয়ে দুজনের পরীক্ষা এভাবেই শুরু হচ্ছে। অসম্ভব দৃঢ় মন নিয়ে এই সততার পরীক্ষা পাশ করার জন্য কোনও আলাদা নম্বর নেই। যা আছে, তা' এক দুর্লভ অনুভূতি। শক্ত হয়ে লোভ জয় করে নিরাসক্ত মনে নিজের কর্তব্য করে যাওয়ার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জন্মায়, সেই আস্থা বিশ্বাস আর সততার প্রথম বীজ বুনে দিতে চাইলেন অশ্বিনী দত্ত। আর কিশোর মনের চেয়ে উর্বর জমি আর মিলবে কোথায় ? তারাই যে সব ভবিষ্যতের মহীরুহ।

বিধুভূষণ এমনই একটি কাজের দায়িত্বে রয়েছে। অঙ্কে সে বেশ কাঁচা। ধরণীবাবু আর গিরিজাবাবুর স্নেহমিশ্রিত বকুনি আর দিস্তা দিস্তা খাতা ভর্তি করে অনুশীলন করে সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবু ঠিক জোর পায় না। মনে সংশয়, এই বুঝি ভুল হল। এর মধ্যেই অশ্বিনীবাবু ডেকে পাঠালেন।

"বিধু, তোমারে একখান কাম করতে হইব।"

"আজ্ঞা করেন মাস্টারমশায়।"

অশ্বিনীবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে জরিপ করেন। ছেলেটি শহরে এসে বেম্মদের সঙ্গে খুব মেতেছে। পড়াশোনায় ভালো। সকলেই বলেন, বিধু মেধাবী। ইংরেজি ভাষায় ইতিমধ্যেই বেশ দক্ষ। সঠিক ব্যকরণে নির্ভুল উত্তর লেখে। ইতিহাস আর সংস্কৃতেও তার খুব আগ্রহ। শুধু যত ভয় তার অঙ্কে।

"অঙ্কের প্রশ্নপত্র লইয়া যাওনের কাজ। প্রেসে যাইতে অইব। প্রেসে দিয়া আসবা তুমি। ছাপা হইলে আবার গিয়া লইয়া আসবা। এইবার এইডা তোমার দায়িত্ব।"

বিধু কেমন বিহ্বল হয়ে তাকায়। এরা কি অন্তর্যামী ? এ কোন পরীক্ষায় তাকে ফেলা হচ্ছে ? সে বেশ ভালো করে জানে তার যাবতীয় দুর্বলতা ওই একটিমাত্র বিষয়ে। ওটিতে উতরে গেলে সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, জলপানি তার বাধা।

"কী ! পারবা না ?"

অশ্বিনী দত্ত তাকিয়ে থাকেন তাঁর ইস্কুলের ছাত্রের দিকে। দুর্বলতা কাটিয়ে লোভ অতিক্রম করে তাকে এবার আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে হবে। একবার সে এই নেশায় আক্রান্ত হলে পৃথিবীর কোনও জাগতিক লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এই শক্তির মজাই আলাদা। পরের সমস্ত প্রজন্মে একবার এই মূল্যবোধ চারিয়ে দিতে পারলেই তাঁর স্বপ্নপূরণ।

বিধুভূষণ চোখে চোখ রাখে অশ্বিনী দত্তের।

বলে, "আমি পারুম মাস্টারমশায়।" প্রণাম করে সে। মনে মনে বলে, "এই পরীক্ষাডায় আমারে উতরাইতেই অইব। তয় গিয়া পরেরডা।"

প্রশ্নপত্র প্রেসে জমা দিয়ে বেশ ফুরফুরে লাগছিল তার। যাক। প্রথম পর্ব পেরিয়ে গেল নির্বিঘ্নে। প্রেসে যিনি কম্পোজিটার, সেই অরুণবাবুর হাতে প্রশ্নপত্র জমা দিতে হয়। প্রশ্নপত্র একটি মোটা কাগজ দিয়ে মোড়ানো। কোনও কিছু দিয়ে বাঁধা বা আঠা দিয়ে আটকানো নয়। যে কোনও সময় স্বচ্ছন্দে খুলে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। কেউ চাইলে প্রশ্ন মুখস্থ করে নিতে পারে। বাড়ি এসে পড়ে নেবে বই খুলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আজ অবধি একজনও এই দুষ্কর্ম করে উঠতে পারেনি। তাদের মনের মধ্যে কেমন যেন ধ্বনিত হয় একটি শব্দ, তার নাম বিশ্বাস। মাস্টারমশাই বিশ্বাস করেছেন তাঁর সততাকে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাবে না।

অরুণবাবু মোটা ফ্রেমের একটি আতসকাঁচ হাতে নিয়ে বসে থাকেন। দু'হাতে ছাপাখানার কালিঝুলি। আতসকাঁচটি নামিয়ে বিধুভূষণের হাত থেকে প্রশ্নের মোড়ানো কাগজটি নিলেন। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী রে ছ্যামড়া, কিসু দ্যাখোস নাই তো?"

বিধুভূষণ চোখ তুলে দৃঢ় স্বরে বলে, "না।"

তার সেই একটিমাত্র শব্দে বড় ধার আর ভার। অরুণবাবু কথা বাড়ান না। অশ্বিনীবাবুর ছাত্রগুলাই সব একরকম। পিঠের শিরদাঁড়াখান লোহা দিয়া তৈরি। মানুষ গড়ার এই কারিগরকে রোজ একবার মনে মনে প্রণাম করেন অরুণ বাঁড়ুজ্যে। এমন একখান মানুষের জন্য মন্দির গড়া উচিত। মন্দিরের বেদিতে বসাইয়া রোজ পূজাআচ্চা করলে তবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাইবেন মানুষডা। মানুষ তো নন তিনি, অ্যাক্কেরে সাক্ষাৎ দেবতা।

প্রেসে প্রশ্ন জমা দিয়ে ফেরার পথেই দুই ব্যক্তির কথোপকথন কানে আসে তার। ফিকফিক করে হাসে সে। এদেশের অধিকাংশ লোকই বৃথা তর্কে প্রচুর সময় নষ্ট করে। বাকরগঞ্জের মানুষ মানেই বাকপটু এবং অতিরিক্ত ভাষী। যে ব্যক্তি অধিক কথা বলে, তার কথায় যে প্রচুর জল জাল আর ভেজাল মিশবে, এ আর বেশি কথা কী! বিধুভূষণ নিজে বরিশাইল্যা পোলা হওয়া সত্ত্বেও এই কাঁচা বয়সেই বোঝে, অধিক কথায় বরিশালবাসীর প্রবণতা থেকেই অবিশ্রান্ত মিথ্যা আর অসত্য ভাষণের সূত্রপাত। অধিকাংশ মোকদ্দমাতেই জাল আর মিথ্যা সাক্ষ্যের ছড়াছড়ি। অবনীদা সেদিন ঘরে বসে বলছিলেন, এ দেশে ফৌজদারি আর দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা এত বেশি যে বিচারকরা সময় সময় রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েন। অনেক সময় মোকদ্দমা অহেতুক জটিল আকার ধারণ করে। কে যে মামলা করল, কী যে তার অপরাধ, সেই অপরাধের সপক্ষে আর বিরুদ্ধে এতরকম সাক্ষ্য যে আদালতে কঠোর মনোযোগ দিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এককালে চোর-ডাকাতের সংখ্যা ছিল লক্ষণীয় রকমের বেশি। পুলিশ কর্মচারীদের সতর্কতায়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রকোপে ধীরে ধীরে তাদের দৌরাত্ম্য কমছে। তবে বরিশালের তেজ আর ক্রোধ তাদের সহজাত। জলমগ্ন একটি জেলায় যেখানে চারিদিকে সবুজের সমারোহ, সেখানে কাঁচা নরম মাটিতে এত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎস নিয়ে কৌতূহল হয়।

পরের সপ্তাহে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু। তার দুদিন আগে প্রেস থেকে অঙ্ক প্রশ্নপত্র এনে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া তার দায়িত্ব। গতবারের সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপাখানা থেকে নিয়ে আসার সময় হরিমোহনের হাত থেকে কাগজের বাণ্ডিল পড়ে গিয়ে সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। শুধু পড়ে যাওয়া নয়, সে বাণ্ডিল থেকে সংস্কৃত প্রশ্নের প্রথম পাতাটি চোখের ওপর একেবারে ঝলমলিয়ে উঠল। হরিমোহন প্রথমে অত্যন্ত অপ্রস্তুত। পথে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত হয়নি। অসাবধানে হাত থেকে এমন জরুরি জিনিস পড়ে যাওয়া একদম কাজের কথা নয়। আসলে হরিমোহন একটু আলাভোলা গোছের। তার ওপর সংস্কৃতে সে বরাবরের লাড্ডু পাওয়া ছাত্র। ডাহা ফেল না করলে সে নিজেই আশ্চর্য হয়। কাজেই তার ওপরেই সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব।

পথে ছাপা কাগজের বাণ্ডিল পড়ে গিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে পড়া অবধি ঠিক ছিল। চুপচাপ গুছিয়ে তুলে নিলেই হল। গোল বাধল তার পরে। গুছিয়ে নিতে গিয়ে হরিমোহন দেখতে পেল প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করছে "কথং চাসৌ স্বর্গান বিশিষ্যতে"। ব্যস। তার মানে এই প্রশ্নটা এসে গেছে। হরিমোহনের সেই যে বুকের ভেতর ধুকপুকুনি শুরু হল, আর তো সে থামে না। সে প্রশ্ন দেখে ফেলেছে, অথচ এই দেখায় তার কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। সে তো ইচ্ছে করে হাত থেকে প্রশ্নের বাণ্ডিল ফেলে দেয়নি। যা ঘটেছে, পুরোটাই তার অনিচ্ছাকৃত।

ইস্কুলে প্রশ্ন জমা দিয়ে এসে ইস্তক ছটফট করছে হরিমোহন। কী করে সে ? ওই প্রশ্নটা তার মানে আসছেই। একবার পড়ে ঝালিয়ে পারলে ছাঁকা কুড়ি নম্বর। পণ্ডিতমশাই রীতিমতো হকচকিয়ে যাবেন ঠিকই। কিন্তু নম্বরে কার্পণ্য করবেন না। সঠিক লিখলে তাঁর নম্বর দিতে আপত্তি নেই কোনও।

সারারাত ঘুমোতে পারল না হরিমোহন। এ তো অন্যায়। অশ্বিনীবাবুর ইস্কুলের ছাত্র হয়ে সে এতবড় মিথ্যার আশ্রয় নেবে ? এ তো প্রবঞ্চনা। ওই প্রশ্নটি পড়ে উত্তর লিখে আসার অর্থ বিশ্বাসহীনতা, অসততা। মনের মধ্যে সত-অসতের দোলাচলে বড় দোটানায় পড়ল এক কিশোর।

সকাল না হতেই সে দৌড়ে চলে যায় অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে। অত ভোরে তাকে ছুটে ছুটে আসতে দেখে গৌরবর্ণ পুরুষ তাঁর সকালের ভজনা থামিয়ে ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকান।

"অত হাপাইস না। হইসে কী ? কারও কোনও বিপদ আপদ অইল নাকি ? আইলি কোত্থিকা ?"

হরিমোহন হাঁফাতে হাঁফাতেই এক নিঃশ্বাসে বলে যায় তার কৃতকর্মের কথা। তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। অথচ সারারাত সেই অন্যায় বিদ্ধ করেছে তাকে। কী করবে এবার সে ? ওই প্রশ্নটা যে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বার।

অশ্বিনী দত্ত তার পিঠে হাত রাখেন। তাকে বলেন, "এয়া কি একখান ভাবনার কথা হইল ? তুমি বরং ওই প্রশ্নখান বাদ দিয়া অন্যগুলির উত্তর লিখিও। কেমন ? তা হইলেই আর দোষ অইব না। কী কও ? ভালো বুদ্ধি দিলাম না ?"

হরিমোহনের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। তা'ই তো। ওই প্রশ্নটার উত্তর পরীক্ষার খাতায় না লিখলেই হল ! ওটা বাদ দিয়ে অন্য আর যা আছে, উত্তর লিখে আসবে সে। তার মনের মধ্যে থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। ঢিপ করে এক প্রণাম করে সে হাসিমুখে বলে ওঠে, "আইজ্ঞা মাস্টারমশায়। তাই অইব। অ্যাহন তবে আসি ..." বলেই একছুটে উঠোন থেকে নেমে দৌড়ে চলে গেল হরিমোহন। তার আগমনে ছিল উদ্বেগ আর যন্ত্রণা। তার দৌড়ে চলে যাওয়ার পথে এক মুক্তির আনন্দ, এ যেন এক পাপবোধ থেকে মুক্ত হবার উল্লাস।

অশ্বিনী দত্ত তার উড়ে চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দুচোখে জলের ধারা বাধা মানছে না আজ।

হরিমোহন সেই পরীক্ষাতেও সংস্কৃতে ডাহা ফেল। কিন্তু তার তৃপ্ত মুখ দেখে বিস্মিত সহপাঠী সকলেই।

"হইসেডা কী ? অ্যাতো ফূর্তির কারণখান কও দেহি।"

তাকে বিস্তারিত বলতে হয়নি। অশ্বিনীবাবু ক্লাসে এসে নিজে দাঁড়িয়ে বলে যান হরিমোহনের আশ্চর্য সংবরণের কোথা। হ্যাঁ সে লোভ জয় করতে শিখেছে। যে অপরাধবোধ তাকে কুটকুট করে কামড়ে ধরে অস্বস্তিতে ফেলছিল, সেই অপরাধকে নিমেষে মুছে ফেলে সে এখন অপ্রতিরোধ্য। কোনও তুচ্ছ নম্বরের লোভ তাকে আর বিচলিত করতে পারেনি।

হরিমোহনের গল্প ছড়িয়ে পড়ে ইস্কুলের ছাত্রদের মুখ থেকে শহরের প্রতিটি অঞ্চলে।

অশ্বিনীবাবুই পারলেন। তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে আরও আগ্রহ তাঁর আদর্শ আর নীতিবোধ নিয়ে আরও উৎসাহ তৈরি হল বরিশালে। বি এম স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়ল। বি এম স্কুলের ছাত্রদের জন্য এক অন্য সম্ভ্রম আর মর্যাদার জায়গা তৈরি হল সর্বত্র।

বিধু হাঁটতে হাঁটতে দেখে টিয়ার ঝাঁক। দলে দলে উড়ে যায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে। বুনো বেতের ফলের ভারে নুয়ে আছে সরু শাখার গাছটি। একবার ভাবে কোঁচড়ে করে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর ভাবে আজ থাক। সামনে পরীক্ষা। আজ ঘরে ঢুকে বরং একবার ইতিহাসটা ঝালিয়ে নেবে। তারপর অন্তত শ'খানেক অঙ্ক কষতে হবে। সংস্কৃত ব্যকরণ তার কণ্ঠস্থ হয়েই আছে। সংস্কৃত তার প্রিয় বিষয়। কিন্তু ইতিহাস তাকে বড় টানে।

ইতিহাসের টানেই সে বাকরগঞ্জের ইতিহাসের পাতা খোঁজে।

আর তার দিনলিপির পাতায় ইমন দেখে মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে – পণ্ডিতনগর; গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামের কথা। যে ফুল্লশ্রী গ্রামের কন্যা বিনোদিনী।

"ঘাঘর ও ঘণ্টেশ্বরের মধ্যবর্তী 'পণ্ডিতনগর' ফুল্লশ্রী গ্রাম বিদ্যাগৌরবমণ্ডিত বাকলার বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তৎকালে এই স্থানে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিলোচনা দাশ কবীন্দ্র, তৎপুত্র জানকীনাথ এবং ভাগিনেয় সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত সর্বপ্রধান। মহাত্মা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র কলাপব্যকরণের 'পঞ্জি' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি এই টীকা কলাপাধ্যায়ী ছাত্রগণের ব্যকরণ বুঝিবার পক্ষে সুগম পন্থারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহারই পুত্র জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার 'চর্করিতরহস্য' নামক ব্যকরণের অংশ বিশেষ যঙ-লুগন্ত প্রত্যয় সম্বন্ধে শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করত নীরস বিষয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন। জানকীনাথের পুত্র ভবানীনাথ সার্বভৌম এবং পৌত্র রঘুরাম কবিকণ্ঠাভরণও পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

বনমালীর আদর্শ চিকিৎসক ছিলেন প্যারীমোহন। তাঁর মতো অভ্রান্ত রোগনির্ণয় করতে পারতেন বনমালী গাঙ্গুলী। কীর্তিপাশায় ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিকাব্য, ব্যকরণ ছাড়াও চর্চা ছিল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের। পন্ডিত প্যারীমোহন দাশগুপ্তকে সকলে বলত স্বয়ং ধন্বন্তরি। তাঁর উপাধি কবিরঞ্জন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাঁর মতো সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত-চিকিৎসক সেইসময় সমস্ত বাংলাদেশেই ছিল বিরল। তাঁর পুত্র অক্ষয়কুমার এবং ভ্রাতুষ্পুত্র উমাচরণ দু'জনেই ছিলেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুচিকিৎসক।

এই পরিবারের সঙ্গে বনমালীর যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল বলে লিখে গেছেন বিধুভূষণ।

ইমন বিধুভূষণের দিনলিপিটি পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে কখন।

(চলবে)

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় 'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ১৩

[পূর্ব কথাঃ ঝুনঝুনওয়ালার ম্যানেজার মিহির দত্তের কথায় একদিন দুজন গুণ্ডা গোছের লোক এসে চা-ঘর তুলে দেবার হুমকি দিয়ে গেল। খবর পেয়ে জিতেন দাস থানার বড়বাবুর সাথে কথা বলে দোকান সুরক্ষার ব্যবস্থা করল। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে সে আজকাল নিয়মিত দোকানে বসতে পারে না। অন্যগদিকে রঘুও রোজ বিকেলে পড়তে বেরিয়ে যায়। দেখাশোনার অভাবে দোকানে টাকা পয়সা নয়-ছয় হচ্ছে। এদিকে স্ত্রীর চিকিৎসাতে সমানে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

জিতেন দাস রঘুকে বলল, যেহেতু সে দোকানের কাজে সময় দিতে পারছে না, সেজন্য জিতেনকে মাইনে দিয়ে আলাদা লোক রাখতে হবে। সেকারণে রঘু সামনের মাস থেকে মাইনের টাকা আর পাবে না। তবে তার চা-ঘরে থাকা, খাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। টাকা পয়সার দুশ্চিন্তায় রঘু কিছু দিন অস্থির হয়ে রইল। তারপর ঠিক করল, জমানো টাকা দিয়ে পরীক্ষা পর্যন্ত চালিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

বিকেলে দোকানে ওর কাজ নেই বলে রঘু টিউশন শুরু হবার অনেক আগেই বই খাতা নিয়ে বেড়িয়ে ত্রিকোণ পার্কে বসে পড়তে শুরু করল। ক্রমশ ওর পড়ার আসরে অঙ্কিত, আনন্দী এবং আরও কটি ছেলে মেয়ে যোগ দিয়ে মহা উৎসাহে সব একত্রে পড়াশোনা করতে লাগল।]

সকালবেলা। চা-ঘর তখন সবে জেগে উঠছে। পৌষ মাস, শহরতলীতে ঠাণ্ডা ভালোই পড়েছে। বাইরে কুয়াশা তখনও পুরোটা কাটেনি। তারই মধ্যে একটা ভুসকো চাদর জড়িয়ে বিরজু, আর রঘুর ছোট হয়ে যাওয়া মোটা জ্যাকেটটা পড়ে বাদল দোকানে চলে এসেছে। রঘু স্টকে কি আছে দেখে নিয়ে, যা যা দরকার তার একটা ফর্দ বানিয়ে সীতারামকে বাজারে পাঠাচ্ছিল। এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। এত সকালে রঘুকে সাধারণত কেউ ফোন করে না। অজানা নম্বরটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে রঘু ফোন ধরল। ওপাশ থেকে কাঁদো কাঁদো গলায় সঞ্জু বলল – "রঘুদা, মা'র খুব অসুখ। তুমি একবার আসবে?" ফোনেই কথা বলে রঘু যা বুঝল, যশোদার বেশ কিছু দিন ধরে শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তাই নিয়েই সে কাজ করছিল। ডাক্তারও দেখায়নি। তিনদিন আগে জ্বর এসেছে। এখন খুব জ্বর। পেটে একটা ব্যথা আছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। স্থানীয় পাড়ার ডাক্তার দেখেছে। বলেছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে! প্রতিবেশী সুলতা মাসী আর বিদ্যুৎদা সঞ্জুর সঙ্গে আছে। ফোনটা সে বিদ্যুতের মোবাইল থেকে করেছিল।

সব শুনে রঘু দশ মিনিটের মধ্যে আসছে জানিয়ে ফোন রেখে দিল।

সীতারামকে বাজারে পাঠিয়ে রঘু মুরারী আর বাদলকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল। তারপর ও ফিরে না আসা পর্যন্ত বাদলকে ক্যাশের দিকটা সামলাতে বলে রঘু বেরিয়ে গেল।

রঘুকে দেখেই সঞ্জু ওকে জড়িয়ে ধরে বলল – "মা ঠিক হবে তো রঘুদা?"

সঞ্জুর উস্কো খুস্কো চুল, রাত-জাগা চেহারার দিকে তাকিয়ে রঘু বলল – "ঘাবড়াচ্ছিস কেন সঞ্জু? আমরা তো আছি!" জ্বরে বেহুঁশ যশোদাকে দেখে বলল – "বিদ্যুৎদা, তাড়াতাড়ি একটা অটো ধরবেন? মাসীকে কালিচক হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।" অটোতে বসেই রঘু অঙ্কিতকে ফোন করে হাসপাতালে আসতে বলল। একটা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্কিত হাসপাতালে চলে এলো। যশোদাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কালিচক হাসপাতাল ছোট হলেও ব্যবস্থা মোটামুটি খারাপ নয়। যশোদাকে ডাক্তার দেখলেন। ওষুধ, ইনজেকশন যা যা দেওয়া দরকার, সেগুলো দিয়ে বললেন – "আপাতত দু চারদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। তবে, চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবে।" একটা প্রেসক্রিপশন রঘুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওতে লেখা ওষুধ আর ইনজেকশনগুলো কিনে আনতে বললেন। প্রেসক্রিপশন দেখে সঞ্জু তাড়াতাড়ি ওর পকেট থেকে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বার করে বলল – "আমার কাছে টাকা আছে রঘুদা।" ওই টাকাতে অবশ্য হোলো না। রঘুর কাছেও ভাগ্যিস হাজার খানেক টাকা ছিল। সেই টাকাটাও দিয়ে ওষুধ বিষুধ সব কেনা হল।

দুপুর দুটো নাগাদ যশোদার অবস্থা কিছুটা ভালো হবার পর, রঘু আর অঙ্কিত হাসপাতাল থেকে বেরোল। বাড়ি ফেরার পথে অঙ্কিত বলল – "তোর তো ওই টাকাটাও চলে গেল। এবার কি করবি ?"

রঘু মাথা নাড়ল – "জানি না। যা হবার হবে।"

চা-ঘরে ফিরে স্নান খাওয়া সারতে না সারতেই রঘুর কাছে বকুলের ফোন এল। যশোদার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকে রঘু অবশ্য অনেকবার বকুলের কথা ভেবেছে। ভাবছিল বকুল ওর মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েছে কি ? খবর পেলে তো আসা উচিত ছিল। কি জানি কি খবর ওর ? বিয়ে করে ফেলেছে নাকি ? অনেক দিন তো কথা হয়নি।

রঘু এপাশ থেকে – "হ্যালো" বলতেই বকুল ওপাশ থেকে ধরা-ধরা গলায় বলল – "রঘু, একটু আগেই সঞ্জুর সাথে কথা হল। ও আমাকে সবই বলেছে। তোর সাহায্য না পেলে আজ যে কী হত জানি না।" এরপর কান্না ভেজা গলায় বকুল অনেক কিছু বলল। ওদের ছোটবেলার বন্ধুত্বের কথা, আপদে বিপদে পাশে থাকার জন্য পরোক্ষে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। এরকম ক্ষেত্রে রঘু কী বলবে বুঝে পাচ্ছিল না। শেষমেশ যে কথাটা ওর মনের মধ্যে ঘুরছিল, সেটাই বলল, "তুই আসবি না ?" বকুল একটু যেন চুপ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল – "তোর সাথে অনেকদিন কথা হয়নি তো, তাই তোকে জানানো হয়নি। আমি একটা সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি। ওটার শুটিং চলছে। আর দিন সাতেকের মধ্যে আপাততঃ আমার শুটিং শেষ হয়ে যাবে। আমি তার পরেই যেতে পারবো রে!" রঘু এবার উৎসাহিত হয়ে বলল – "আরেব্বাস, এতো দারুণ খবর! তুই টিভি সিরিয়ালের নায়িকা হয়ে গেলি !"

"না রে, নায়িকা নয়।" হেসে বলল বকুল, "নায়িকার বান্ধবী। ছোট রোল। তবু তো একটা সুযোগ পেয়েছি। এখন শুটিং ছেড়ে চলে গেলে এরপর আর চান্স পাব না, টাকাও পাবো না। অনেক কষ্ট করে, দু-বছর ধরে এর তার পিছনে ঘুরে একটা অভিনয়ের সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন চেষ্টা করব যাতে এরকম কাজ আরো পাই।"

"কিন্তু, তুই যে বিয়ে করবি বলেছিলি! প্রমোদ কিছু বলবে না ?"

"প্রমোদ কী বলবে ? ও এখন বম্বেতে জমে গেছে। আরো কাজ পেয়েছে। এখানে আর ফিরবে কিনা সন্দেহ। আর আমিও ঠিক করেছি এখন বিয়ে টিয়ে করব না। পরে দেখা যাবে।"

"ও, আচ্ছা।" বলে রঘু ফোনটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন বকুল বলল – "আরেকটা কথা রঘু। আমি সঞ্জুকে কিছু টাকা পাঠাতে চাই। তোর আপত্তি না থাকলে তোর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবো। একজন আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বলেছে।"

"ঠিক আছে। আমার কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাকাউন্ট নম্বর তোকে পাঠিয়ে দেবো।" একটু হেসে রঘু যোগ করল – "তবে ভেবে দেখিস, টাকাটা আমি কিন্তু মেরে দিতে পারি।" বকুলও হাসল – "তুই কি পারিস আর না পারিস, সেটা আমি খুব ভালো জানি। মায়ের জন্য তোরও বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছে আমি জানি। তোরও তো এখন টাকা দরকার। তাই আমি টাকা পাঠালে তুই যে টাকাটা খরচ করেছিস, সেটা ওখান থেকে রেখে দিবি। বাকি টাকা সঞ্জুকে দিয়ে দিস।" বকুল ফোন রাখতেই রঘু ঘড়ি দেখল। সাড়ে তিনটে বাজে। শীতের বেলা। আজকাল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই দিনের আলো ফুরিয়ে যায়। রঘুরা তাই আজকাল সাড়ে তিনটের মধ্যেই সবাই ত্রিকোণ পার্কে পৌঁছে যায়। বই খাতা ঝোলা ব্যাগে ভরে তড়িঘড়ি বেরোচ্ছিল রঘু। চা-ঘরের দরজায় দেখা হয়ে গেল জিতেন দাসের সাথে। জিতেন আজকাল রোজ চা-ঘরে আসে না। মাঝে মাঝে আসে। আর এলে পরে এরকম বিকেলের দিকে, ঘন্টা দুয়েকের জন্য আসে। রমলা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় জিতেনও কেমন চুপ হয়ে গেছে। আগের মতো আর হৈ চৈ করে কথা বলে না। রঘুর দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বলল – "পড়তে যাচ্ছিস ? আজ না হয় পাঁচ মিনিট পরে যাস। আয়, ভিতরে আয়, দুটো কথা বলি। কতদিন পর তোকে দেখলাম। আজকাল যখনই আসি, দেখি তুই পড়তে বেরিয়ে গেছিস।" জিতেনের পিছন পিছন রঘু আবার চা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে

বলল – "হ্যাঁ দাদু, পরীক্ষা কাছে এসে গেছে তো !" প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞাসা করল – "দিদিমা কেমন আছে ?" নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে জিতেন মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল – "ওই একই রকম আছে। এতদিন ধরে চিকিৎসা করাচ্ছি, কিন্তু অবস্থার কিছু উন্নতি হচ্ছে না। আজকাল কদিন ধরে বারবার হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে যেতে চাইছে!"

– "তাই? কি করবে ?"

– "ভাবছি, একবার ঘুরিয়ে আনি।"

– "কবে যাবে ?"

– "দেখি! ওদিকে তো খুব ঠান্ডা এখন। ঠান্ডা একটু কমুক, তারপরে যাব।"

– "হ্যাঁ, সেই ভালো।"

মুরারী রান্নাঘর থেকে এককাপ চা এনে জিতেনের সামনে টেবিলে রেখে বলল – "পাশের ডোবা ভরাট করে জমিটা কী সুন্দর বানিয়ে ফেলেছে, দেখেছেন বাবু ? পিছন দিকে বাড়ি বানানোর কাজও শুরু করে দিয়েছে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে জিতেন বলল – "হ্যাঁ, দেখেছি। তা করুক, নিজের জমিতে যা খুশি করুক। শুধু আমার চা-ঘরের দিকে নজর না দিলেই হয়।"

রঘু চট করে মোবাইলে সময়টা দেখে নিয়ে বলল – "দাদু, আমি তাহলে আসি ?"

জিতেন মাথা নেড়ে বলল – "হ্যাঁ, যা। ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে তুই এসে দোকানের হালটা ধর দেখি। আমি তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। এখানে সব যে ভাবে এই দোকানের জমির দিকে হাত বাড়িয়ে বসে আছে যে দোকান ছেড়ে কোথাও যেতেই আমার ভয় করছে!"

দুদিন বাদে যশোদাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল। সঞ্জু আর রঘু গিয়ে যশোদাকে বাড়ি নিয়ে এল। বকুলের পাঠানো টাকা সঞ্জুর হাতে দিয়ে রঘু বলল – "ওষুধ আর খাওয়া দাওয়া ডাক্তার যেমন যেমন বলেছেন, তেমন করেই খাওয়াবি।" যশোদার দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলল – "মাসী, তুমি কিন্তু আর কাজে যাবে না। বকুল বারণ করে দিয়েছে।" তার পর হেসে যোগ করল – "ও এখন সিরিয়ালে অভিনয় করে। দরকার মত ও মাঝে মাঝে টাকা পাঠাবে। মাসী, তুমি এখন একদম বিশ্রাম নাও।"

ছলছল চোখে যশোদা বলল – "রঘু, তুই মাঝে মাঝে আসবি তো ?" রঘু বিছানায় যশোদার পাশে বসে নরম গলায় উত্তর দিল – "মাসী আমার পরীক্ষা সামনে। পড়ার একটু চাপ আছে। তাই এদিক ওদিক কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু সঞ্জুকে বলে দিয়েছি, দরকার হলেই আমাকে খবর দেবে। তুমি একটুও চিন্তা করবে না।

সেদিন তেকোণা পার্কে এসে আনন্দী ফিসফিস করে রঘুকে জানালো – "গতকাল রাতের ফ্লাইটে মামু এসেছে। পরশু বিকেলে এখানে আসবে।" যশোদা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসায় আর ওদের আর্থিক সমস্যা আপাততঃ মিটে যাওয়ায় রঘুর মনটা আজ এমনিতেই ভালো ছিল। তার উপরে এখন নিখিলেশের আসার খবর পেয়ে ওর মুখটা আনন্দে ভরে উঠল। পরক্ষণেই আনন্দীর মামু আসার খবরে ওর এত আনন্দ হচ্ছে দেখে ও নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেল। প্রশ্ন করল – "নিখিলমামা কি এই পার্কেই আসবে ?" হাসি মুখে মাথা নেড়ে আনন্দী বলল – "এখানেই আসবে। আমি সব গল্প করে বলে দিয়েছি তো ! আমি এটাও বলেছি, আমরা পার্কে বসে সবাই একসাথে পড়ছি বলে আমার বাড়ি থেকে কত ঝামেলা করেছে ! আমরা কি করছি সেটা লোক পাঠিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওয়াচ করেছে ! যেন আমরা কতগুলো ক্রিমিনাল ! ওরা

ভাবছিল যে আমরা প্রেম করছি!” বলতে বলতেই খিলখিল হেসে উঠল আনন্দী! “ভাগ্যিস আমি জেদ ধরে বসেছিলাম। সত্যি রে, পড়াশোনায় এত মজা আমি কোনো দিন পাইনি।” খুশির হাসিতে আনন্দীর মুখটা ঝলমল করে উঠল।

দুদিন পর, চব্বিশে ডিসেম্বর, বড়দিনের আগের দিন সন্ধ্যের মুখে নিখিলেশ ত্রিকোণ পার্কে এল। সবকটা ছেলেমেয়ের সাথে আলাপ করে, সবার সাথে পার্কের বেঞ্চে বসে গল্প করল। সঙ্গে কিছু প্যাস্ট্রি, প্যাটিস আর কোল্ড ড্রিংক নিয়ে এসেছিল সে। সবাই মিলে হৈ চৈ করে সেগুলো খেল। এ সবের পর সে রঘুকে ডেকে বলল – “তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে। চল, মাস্টার মশাই এর বাড়ি গিয়ে কথা বলব। ওনারও কথাগুলো জানা দরকার। আজ তো তোর কোনো টিউশন ক্লাস নেই। আমি আনন্দীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।” এত হৈচৈ এর পর হঠাৎ নিখিলেশ গম্ভীর হয়ে এই কথাগুলো বলাতে রঘু কেমন ঘাবড়ে গেল। ওর পেটের মধ্যে ভয়ে গুড়গুড় করতে লাগল, অথচ মুখে কিছু বলতে পারল না। নিখিলেশ এবার ভাগ্নীকে বলল – “গাড়িটা রঘু আর আমাকে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিক। পরে আমার ফেরার সময় আমি ফোন করে দেবো।”

বীরেশ্বর মল্লিকের বাড়িতে রঘু, নিখিলেশ আর বীরেশ্বর মাস্টার বসেছিল। রঘু ভাবছিল, তাকে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে নিখিলমামা কি বলতে এসেছেন ! অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন উনি ! তাহলে সে কি অজান্তে কিছু অন্যায় করে ফেলেছে ? আনন্দী সংক্রান্ত কিছু নয় তো ? সেই যে আনন্দী বলছিল, ওর বাড়িতে নাকি ভাবছিল যে রঘুর সাথে ও প্রেম করছে – সেটা নিয়ে কিছু বলবে না তো ? কিন্তু ওটা তো একদম ঠিক নয়। ওরা দুজন তো শুধুই বন্ধু ! কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে রঘু একেবারে শক্ত হয়ে বসেছিল।

কুশল আদান প্রদান আর প্রাথমিক দু চারটে কথাবার্তার পর নিখিলেশ বলল – “মাস্টারমশাই, আজ আমি বিশেষ ভাবে রঘুর ব্যাপারে কিছু কথা বলার জন্য-ই আপনার কাছে এসেছি।”

বীরেশ্বর কৌতূহলের দৃষ্টিতে নিখিলেশের দিকে তাকালেন। এরপর নিখিলেশ যা বলল তার মর্মার্থ হল এই যে, গত একবছর ধরে রঘুর পড়াশোনায় আগ্রহ এবং মেধা দেখে ওর মনে হয়েছে ছেলেটা একটু উৎসাহ আর সহযোগিতা পেলে অনেক দূর এগোবে। ভগবানের কৃপায় নিখিলেশের কাছে সেই সাধন আছে যা রঘুর কাজে লাগতে পারে। তাই সে চায়, রঘু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে তার কাছে চলে আসুক। ওর কাছে থেকে, দিল্লির কলেজে পড়াশোনা করুক। নিখিল এই পর্যন্ত বলে থামল। বীরেশ্বর মল্লিক আর রঘু একেবারে চুপ করে নিখিলেশের কথা শুনছিল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিখিলেশ আবার বলল – “আসলে, রঘুর অভিভাবক বলতে আমার আপনার আর চা-ঘরের জিতেন দাসের কথাই মনে এল। আপনাদের না বলে তো আমি ওর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাই আপনাকেই প্রথম জানালাম। যদি আপনি অনুমতি দেন তো এরপর আমি জিতেন দাসের সাথে কথা বলব।”

বীরেশ্বর একটু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর কোনো কথা না বলে রঘুর দিকে তাকালেন। রঘুর কাছে পুরো ব্যাপারটা এতোটা আকস্মিক আর আশাতীত যে ও কি করবে, কি বলবে কিছু বুঝতে পারছিল না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সসঙ্কোচে, থুতিয়ে থুতিয়ে বলল – “কিন্ত ... মানে ... আমি তো ...!!”

এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে নিখিলেশ বলল – “রঘু, তুমি বড় হয়েছ, আমি জানি। কিন্তু এত বড় হয়ে যাওনি যে আমাদের মাঝখানে কথা বলবে! তোমার যা বলার আছে সেটা আমি পরে শুনবো।”

রঘুর দুচোখ জলে ভরে গেল। সেটা দেখে নিখিলেশ মজা করে বলল – “সে কি রে ! এইটুকু বকুনিতেই চোখে জল এসে গেল ?”

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে, হাসি-কান্না মিশিয়ে রঘু উত্তর দিল – “এত ভালোবেসে কেউ কখনও আমাকে ধমকায়নি মামু।” নিখিলেশ স্নেহের হাসিতে মুখ ভরিয়ে রঘুর মাথায় পিঠে আদরের হাত বুলিয়ে দিল।

বীরেশ্বর মল্লিক নিখিলেশের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছাত্রের মাথায় আশীর্বাদের হাত রেখে বললেন – "বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাক। আজ তোমার মাস্টার মশাই বলে আমার খুব গর্ব হচ্ছে। আগেও হত। কিন্তু সেটা ছিল তুমি বীর সাহসী আমাদের দেশরক্ষক সেনানীদের একজন বলে ! আর আজ, আমি তোমার মধ্যে একজন বিশুদ্ধ মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। রঘু কে আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি। আট বছর বয়স থেকে ও সমস্ত প্রতিকুল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে শুধু নিজের চেষ্টায় এখানে এসে পৌঁছেছে। রঘুর অভিভাবক ও নিজে। ওর অভিভাবক হবার সাধ্যই নেই আমার। আমি শুধু আমার সামান্য ক্ষমতা নিয়ে ওকে একটু সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। তবু তুমি যখন আমাকে সম্মান দিয়ে এই কথাটা বললে, তখন বলি, তোমার সিদ্ধান্তে আমার পুরো সমর্থন আছে। আমিও চাই পড়াশোনা শিখে ও অনেক বড় হোক।"

নিখিলেশ এবার উৎসাহ ভরে বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল – "বাস, তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই। রঘু, তুই মনে মনে তৈরী হয়ে যা। পরীক্ষার পর আমি টিকিট পাঠিয়ে দেব। তুই দিল্লী চলে আসবি। নয়ডাতে আমার বাড়ি আছে। সেখানে আমার দুটো কুকুর আছে আর তোর মতোই দুটো ছেলে আছে। ওরাও ওখানে থেকে পড়াশোনা করে। তুই আয়, তখন আলাপ সালাপ হবে। রেজাল্ট বেরোনোর আগে পর্যন্ত ওখানে থাকবি আর তার মধ্যে কমপিউটারের ব্যবহার শিখে নিবি। আজকের যুগে ওটি একেবারে এসেনশিয়াল।" একটু থেমে রঘুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বলল – "আমি তো সব বললাম। এবার তোর কি বলার আছে বল।"

রঘু বিহ্বল চোখে দুজনের দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঢিপ ঢিপ করে দুজনের পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করল। ঘরের মধ্যে তিনটি অসমবয়সী মানুষ! মুখে তাদের অনাবিল হাসি। ঘরের বাইরে কালীচকে তখন শীতের রাত ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে।

(আগামী পর্বে সমাপ্য।)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৪

আজকাল একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে জয়িতা। স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশী পরিশ্রম বা উত্তেজনা হলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তার। এখন যেমন হচ্ছে। সোম বেরিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়েছিলো সেও। পাপানের স্কুলে যেতে হয়েছিলো আজ। পাপান স্কুলে এক বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করেছে। তাতেই গার্জেন কল হয়েছিল। পাপানটা বেশ দুষ্টু হয়ে উঠছে। সারাদিন খালি দুষ্টুমি করতে থাকে, পড়াশুনায় মনই নেই তেমন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকল, খালি চেষ্টা করে সর্বক্ষণ ভিডিও গেমস্ খেলবার। জয়িতা ছোটবেলায় এত দুষ্টু আর অবাধ্য ছিলনা মোটেই। বাবা, মা-র ছোট্ট সংসারে থাকত সে। বাবা সরকারী অফিসের কেরানী, মা স্কুলের দিদিমনি। সন্ধ্যার আগে বাবা মা-র সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও সুযোগ থাকতনা। বিকেলে স্কুল থেকে এসে পাড়ার উষাকাকীর বাড়ি ঢুকে পড়ত জয়িতা। সেখানেই হাত মুখ ধোওয়া, বিকেলের জলখাবার খাওয়া, উষাকাকীর মেয়ে, তার বন্ধু স্বাতীর সঙ্গে গল্প আর খেলাধূলা। অন্য মানুষ, অন্য পরিবারের আঁচলে বড় হওয়ার একটা সুবিধা আছে বোধহয়। যত ছোটো বাচ্ছাই হোক, সে বোঝে, যেখানে সে আছে, সেটা যত যাই হোক, অন্যদের বাড়ি, এখানে যা খুশী তাই করাটা ঠিক নয়। তাতে বাচ্ছার একটা নিজস্ব সহবত শিক্ষা গড়ে ওঠে। জয়িতা বোঝে, তার নিজের বেলায় এটা হয়েছিলো। কিন্তু পাপানের তো সে বালাই নেই। অতএব ইচ্ছামতো দুরন্ত হয়ে উঠছে সে। আর সোমটাও বড্ড আশকারা দেয় মেয়েকে। আর মেয়েও তো বাবা বলতে অজ্ঞান। সে তো জানেই, বাবা দলে থাকা মানে অর্ধেক রাজত্ব আগে থেকেই জয় করে ফেলা। আর জয়িতাকে তো মানতেই চায়না। জানে, মা তো খালি চেঁচাবে, সুপ্রিম কোর্ট তো বাবা। জয়িতার মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায় , মনে হয় অতই যখন বাবা ন্যাওটা, সে থাকবেনা মেয়ের কোনও ব্যাপারে। কিন্তু রাত্রে যখন জয়িতার গলা জড়িয়ে ধরে পাপানটা একদম পুঁচকে মেয়ের মতো আদর খেতে চায়, তখন জয়িতার সব রাগ জল হয়ে যায়। তখন তার ভেতর থেকে যাবতীয় স্নেহ নিমেষে উঠে আসে। আসলে জয়িতা এ'রকমই। বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না সে। তার শুধু ছেলেমানুষের মতো খুব অভিমান হয় যখন তখন।

জয়িতা ভাবল, একবার কি সোমকে ফোন করে পাপানের স্কুলের রিপোর্টটা দেবে সে ? তারপরেই ভাবল, দুর ! দিয়ে কি হবে ? সোম মন দিয়ে শুনবেইনা। বলবে, ''ও বাচ্ছারা অমন একটু-আধটু করে''। এর নাম একটু-আধটু ? একটা ধারি মেয়ে স্কুলে মারপিট করেছে, একে একটু-আধটু বলে ? সোম এ'রকমই। জয়িতার কোনও কথার যেন কোনও গুরুত্বই নেই। আজকাল সোমের উপরও খুব অভিমান হয় জয়িতার। সোম যেন ক্রমশ দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আগে, মানে বিয়ের পরপর এমন ছিলোনা সোম। তখন জয়িতাকে কত সময় দিত সে। তারপর চাকরিতে যত উন্নতি হতে লাগল, যত সোম তাতে ডুবে যেতে লাগলো, ততই যেন সরে যেতে লাগল জয়িতার থেকে। এখন তো সোম তার চাকরি আর কবিতা লেখা নিয়েই ব্যস্ত সর্বক্ষণ, বাড়িতে যতক্ষণ থাকে মেয়ের সঙ্গেই সময় কাটায় বেশী, জয়িতার জন্য সোমের হাতে সময় বড় কম। মাঝে মাঝে জয়িতা ভাবে, কেন এমন হল ? সে তো সোমকে আজও খুব ভালোবাসে, জয়িতা জানে সোমও তাকে ভালোবাসে, তবু তারা নিজেদের মধ্যে বলবার জন্য যথেষ্ঠ কথা খুঁজে পায়না কেন ? সে না হয় একটু চুপচাপ ধরণের মানুষ, কিন্তু সোম তো যথেষ্ট কথা বলে, তবে ? তবে কি সোমেরও কোনও অভিমান আছে তার উপর ? কি সেই অভিমান ? সে সোমের ওইসব অফিস, লেখালেখি বোঝেনা, তাতেই কি সোম তাকে আর নিজের যথেষ্ঠ উপযুক্ত বলে মনে করে না ? জয়িতা সোমকে জিজ্ঞাসাও করেছিলো সেই কথা। সোম পরিষ্কার উত্তর দেয় না কখনও। শুধু বলে, ''জয়িতা, নিজের জন্য কিছু অভ্যাস গড়ে তোলো। খালি সারাদিন সংসার আর পাপানের পড়া – এই নিয়ে না থেকে নিজে কিছু করো। কোনও চাকরি করতে পারো অথবা অন্য কিছু যা তোমার করতে ভালো লাগে''। দুর ! চাকরি-টাকরি করা পোষাবে না জয়িতার। ও'সব কোনও দিনই চায়নি সে। চিরকালই সে জমিয়ে একটা সুখী সংসার করতে চেয়েছে স্বামী-সন্তান নিয়ে। তার একটা সংসার হবে, সে সংসারে স্বাচ্ছল্য থাকবে, সে আর অন্য সবাই খুশী থাকবে -ব্যস ! এই হলেই সে খুশী। তাই তো হয়েছে।

তার জীবনে। সোম মানুষ ভালো, পাপানের মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে তার সন্তান, বলতে নেই, তার সংসারে টাকা-পয়সা উপচে পড়ছে। তবু তার কোনও কিছু ভালো লাগে না কেন, কে জানে। আর তার নিজের ভালো লাগার মতো কিছু ? কি আর ভালো লাগে তার। ভাবতে হবে। আসলে, কিছুই আর তেমন ভালো লাগেনা তার, উৎসাহ পায় না। হ্যাঁ, শপিং করতে বেশ ভালো লাগে তার। কিন্তু, কত শপিং করবে। দুর ! তথাগতটার বিয়ে হতে পূজাকে দেখে খুশী হয়েছিলো সে। পূজা মেয়েটাও শপিং করতে খুব ভালোবাসে। বেরোচ্ছিলও দুজনে একসঙ্গে মাঝে-মাঝে। কিন্তু তথাগতটা জঙ্গলমহলে চলে যাওয়ার পর থেকে পূজা এমন মন খারাপ করে আছে যে বেরোতেই চাইছেনা। আর, তাছাড়া সত্যি বলতে কি, পূজার সঙ্গে বেরিয়ে সবসময় তার পোষায় না। যতই হোক, সে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তার কেনাকাটার নজর, খাওয়া-দাওয়া ধরণ -এর সঙ্গে পূজার ধরণ মেলেনা। পূজা নামী নামী ব্র্যান্ডেড দোকানে ঢুকবে, নিয়মিত নামকরা সব রেস্তোঁরায়, অমন জয়িতা পারেনা। অত টাকা দিয়ে কেনাকাটা করতে তার মধ্যবিত্ত মনে কোথায় যেন খচখচ করে। আর তাছাড়া সে তো শাড়ি পার্টি, খুব জোর সালোয়ার। পূজার পিছন পিছন ও'সব জিনস্ টপের দোকানে খামোকা ঘুরতে ভালো লাগে না তার। দুর ! এত মানুষ এত কিছু করছে, জয়িতারই যেন কিচ্ছু করার নেই। একটা সময় ধ্রুপদী নাচ শিখত সে। বাবা খুব শখ করে একটা নাচের স্কুলে ভর্তি করেছিল তাকে। জয়িতাও মন দিয়ে শিখেছিলো, পাড়ার নানা ফাংশনে বেশ ডাক পড়ত তার। কিন্তু সেসব তো কবেই চুকে বুকে গেছে। এতদিন পরে কি ও'সব আর পারবে সে এই বুড়ি বয়সে ? এ'সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এতদিন পরে একটু নাচ করবার শখ হচ্ছে জয়িতার। নাচবে নাকি খানিকটা ? পারবে ? পাপানটাও নাচ শেখে। ওর একটা সিডি চালিয়ে চেষ্টা করবে একটু, নিজের অদম্য ইচ্ছাকে বশে আনতে না পেরে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সিডিটা চালিয়ে দিলো জয়িতা। চুপ করে বসে তালটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছু পরে জয়িতা অবাক হয়ে বুঝল যে সে বসে থাকলেও তার পা বাজনার ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে। ছন্দে-ছন্দে সে পা ঠুকছে মাটিতে। শাড়ির আঁচলটা উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে গুঁজে নিলো সে, ধীরে ধীরে মুদ্রাগুলো আনবার চেষ্টা করছে জয়িতা হাতে, পায়ে। নাঃ শরীরটা বড্ড ভারী আর আড়ষ্ঠ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস ছন্দটা ঠিকমতো ধরতে দিচ্ছে না। তবু নাচতে লাগলো জয়িতা। তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। নিজের অজান্তেই নাচের গতি দ্রুত করে ফেললো জয়িতা। আগের চেয়ে তার নিজেকে হালকা লাগছে এখন। এই তো ! পা গুলো এখন ঠিক ঠাকই পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। আস্তে-আস্তে নাচে ডুবে গেলো জয়িতা। একমনে নাচতে লাগলো। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো দশ-বারো বছরের একটা মেয়ের ছবি, পাড়ার ছোট্ট স্টেজে, জনা তিরিশ চল্লিশ দর্শক তাদের সামনে মেয়েটা নেচেই চলেছে আর নাচ শেষ হতেই একদৌড়ে বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, ''ভালো হয়েছে বাবা ?''। জয়িতা নিজেকে হারিয়ে ফেললো। সে এখন যেন অন্য কেউ, অনেক পুরোনো দিনের কেউ। এসি ঘরেও এখন টপটপ করে ঘাম ঝরছে তার, গায়ের জামা ভিজে শপশপে, শাড়ি বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে, তবু জয়িতা নাচ থামালোনা, নেচেই চলল। তার মাথায় এখন পাপান, সোম, সংসার, শপিং কিচ্ছু নেই। শুধু সে আর এক ছন্দ। নিজেকে গলিয়ে গলিয়ে সে ছন্দে মিশিয়ে দিতে লাগলো জয়িতা। উন্মত্ত ঝড়ের মতো শরীর চলছে এখন তার। পাগলের মতো একনিষ্ঠ সাধিকার মতো নেচে যেতে লাগল সে। থামতে ইচ্ছা করছে না তার। সে যেন কিছুই চায়না আর আজ। হঠাৎ এক টাল। বুকের মাঝখানটায় হঠাৎ একটা টাল, একটা চাপ অনুভব করলো জয়িতা। উন্মত্ততা আর নাচ থামাতেই জয়িতা টের পেলো ভীষণ হাঁফ শুরু হয়ে গেছে তার। বুকের মধ্যে ভীষণ একটা কষ্ট শুরু হয়েছে। এত ধকল নিতে চাইছেনা অনভ্যস্ত ফুসফুস। ফাঁকিবাজীর তাগিদে জয়িতার অসুখটাকে এগিয়ে দিয়েছে সে। কোনওরকমে বেডরুমে গেল জয়িতা। ইনহেলারটা কোথায় ? ওহ ! ব্যাগের ভিতর। হাতড়ে-হাতড়ে কোনওরকমে ওটা বের করে মুখে পাম্প করল জয়িতা। কমে আসছে, এবার কমে আসছে। ওফ ! আজ খুব ভোরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো টানটা। মনে হচ্ছিলো বুকটা ফেটে যাবে। এখন কমে আসছে। নিজেকে ভীষণ অবসন্ন লাগছে। আয়না দিয়ে একবার নিজেকে দেখে টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল জয়িতা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে তার এখন। জয়িতা ঘুমিয়ে পড়ল।

গাড়িটা সিগন্যালে দাঁড়াতেই ডানদিকের ফুটপাতের ধারের চেরি গাছগুলোর দিকে চোখ চলে গেল অনিন্দ্যর। এমনিতে গাছপালা নিয়ে কোনও আবেগ নেই তার, এই মুহূর্তেও সে প্রকৃতি দেখে তেমন কিছু যে বিহ্বল হয়ে গেলো তা নয়। আসলে চেরিগাছগুলো দেখে উত্তপ্ত মাথাটায় আরও কিছু উত্তাপ বেড়েই গেলো তার। গাছগুলো যেন এই মুহূর্তে তার অসহায়তার

প্রতীক হয়ে উঠেছে বলে অনিন্দ্যর মনে হতে লাগল । এই গাছগুলো এই রাস্তা, এই ট্রাফিক সিগন্যাল আর কিছুদিনের মধ্যেই তার জীবনে অতীত হয়ে যেতে পারত, কিন্তু পরিস্থিতি যেদিকে গড়িয়েছে, তাতে এ' শহর ছেড়ে তারা চলে যেতে পারবে বলে অনিন্দ্যর মনে হচ্ছে না । শিঞ্জিনি সেই যে বেঁকে বসেছিলো দেশে ফিরবেনা বলে, এখনও সে নিয়ে কোনও হেলদোল মেয়েটার মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা । সেদিন থেকে অনিন্দ্যদের সংসারে আবহাওয়াটা প্রচন্ড থমথমে, কে যেন এই ট্রাফিক সিগন্যালটার মতোই লাল আলো জ্বেলে থমকে দিয়েছে তাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতিটা ।

সিগন্যালটা সবুজ হয়ে উঠতেই গাড়িটার গতি হু হু করে বাড়িয়ে দিলো অনিন্দ্য । ওর মাথার মধ্যেও চিন্তা ও রক্তের গতি এখন এই গাড়িটার গতিতেই ছুটছে । সত্যি বলতে কি, অনিন্দ্য শিঞ্জিনির এই পাগলামোর পিছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না । এতদিন যে মানুষটা হা-হুতাশ করে এলো দেশের জন্য এমন কি শিঞ্জিনিকে কান্না-কাটিও করতে দেখেছে সে, মাঝে মাঝে যখন দেশে ফিরেছে, অনিন্দ্য দেখেছে শিঞ্জিনি কেবল শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে উঠত দেশে ফেরবার নামে, সেই মানুষ টা আজ স্থায়ীভাবে দেশে ফেরবার সুযোগ পেয়েও ফিরতে চাইছে না । কেন ? সে নাকি তার ওই বাংলা শেখানোর স্কুল ফেলে যেতে পারবেনা অদ্ভুত ! শিঞ্জিনির ওই শখের স্কুলটা অনিন্দ্যর কেরিয়ারের চেয়ে বড়ো হয়ে গেলো ! এটা একটা যুক্তি হলো কোনও ? আর তাছাড়া, আছে তো ওই কেভিন বলে মার্কিন ছোকরাটা, ভালোই তো চালায় ও শিঞ্জিনির স্কুল, ওকেই তো দায়িত্ব দেওয়া যায় স্কুলটা চালানোর । এমন তো নয়, শিঞ্জিনি বিশ্বাস বা ভরসা করেনা ওই ছেলেটাকে, খুবই করে । ওদের মধ্যে যে একটা বিশেষ রসায়ন আছে, সেটা খুব ভালো করেই বোঝে অনিন্দ্য । কিন্তু সে ও'সব গায়ে মাখেনা । পুরোনো বউ একটা প্রেমিক জোটালে তেমন আপত্তির কিছু দেখেনা অনিন্দ্য । তাতে যদি খুশী থাকে ভুলে থাকে, সে বরং ভালো, অনিন্দ্যর জ্বালাতনটা কম হয় । তার তো আর অত সময় নেই যে শিঞ্জিনির সঙ্গে বসে গাছ, ফুল, কবিতা করে সারাদিন কাটাবে । আচ্ছা, তাহলে কি ওই কেভিন ছোকরার টানেই এখানে থেকে যেতে চাইছে শিঞ্জিনি ? কেভিনের সঙ্গে ওর রসায়নটা কি এতই গাঢ় যে দেশে ফিরতেও মন চাইছেনা ? নাকি নিছক জেলাসি ? শিঞ্জিনিও তো পড়াশুনায় ভালোই ছিলো, এখানে এসে ওই শখের স্কুল ছাড়া কোনওদিন তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি বলেই কি অনিন্দ্যর কেরিয়ারকে হিংসা করে শিঞ্জিনি ? বাবুয়া কিন্তু সেটাই বলছিলো । বাবুয়াটা খুব চটে আছে ওর মা-র উপর । বড় হচ্ছে তো, ভালো মন্দটা বুঝতে শিখছে । বাবুয়াকে দেখলে ভালো লাগে অনিন্দ্যর । বাবুয়াটা একদম তার মতো হচ্ছে, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন আর কেরিয়ারের প্রতি একমুখী । এ'রকম না হলে মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে নাকি ? অনিন্দ্য দেখছে, বাবুয়া ওর মা-র খামখেয়ালীপনা গুলোকে একদম সহ্য করতে পারে না । শিঞ্জিনির মতো খামোকা বৃষ্টিতে ভেজা বা চাঁদ দেখা ওর পোষায় না । এই যে বাবুয়া তার সিদ্ধান্তটাকে সমর্থন করছে, তার পিছনে, অনিন্দ্যর মতোই, ওর দেশে ফেরার কোনও টান কিন্তু কাজ করছে না । বাবুয়া আসলে বুঝতে পারছে যে ফিরলে অনিন্দ্যর কেরিয়ারে একটা জাম্প হবে তাই সমর্থনটা দিচ্ছে । বাবুয়াই বলছিলো যে শিঞ্জিনি বোধহয় তার কেরিয়ার সম্পর্কে জেলাস, তাই এতো গন্ডগোল পাকাচ্ছে । হতে পারে, অনিন্দ্য ভাবলো । বাবুয়া তো এমনও বলেছে যে মা-র কোনও কথা শুনতে হবে না, নিজের কেরিয়ারটা সবার আগে । কিন্তু অনিন্দ্য বোঝে, ওভাবে হয় না । জোর করে তো আর সে শিঞ্জিনিকে ধরে নিয়ে যেতে পারবেনা । বিশ্রী একটা পরিস্থিতি তৈরী হয়ে যাবে । তবে অনিন্দ্য ঠিক করেছে, আজ বাড়ি গিয়ে সে শিঞ্জিনির সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করবে, শিঞ্জিনিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে বেশ, শিঞ্জিনি যখন তার নিজের স্ত্রী হয়ে তার কথাটা ভাবছেনা, তখন অনিন্দ্য বরং শিঞ্জিনির কথাটা ভাববে । দেশের চাকরির অফারটা ফিরিয়ে দেবে সে । আসলে, আজও ফোন এসেছিলো ওই কোম্পানিটা থেকে । তারা অনিন্দ্যর থেকে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত চায় । অনিন্দ্য আজও ঝুলিয়ে দিয়েছে ইস্যুটা কে, কিন্তু আর বেশীদিন পারবেনা, সে জানে । ভালো চাকরি বেশীদিন অপেক্ষা করে থাকে না কারও জন্য । ভালো চাকরি করবার লোকের অভাব নেই আজকের পৃথিবীতে । তাই আজ অনিন্দ্য একটা শেষ চেষ্টা করবে । খুব ঠান্ডা মাথায় সে যে শিঞ্জিনির জন্যই এই ত্যাগ স্বীকারটা করতে বাধ্য হচ্ছে, এই ইমোশানাল ব্ল্যাকমেলিংটা করবে সে । যদি তাতে কাজ হয় । আসলে শিঞ্জিনিটা সব ব্যাপারে এত নিস্পৃহ । মাঝে-মাঝে ওকে দেখলে অনিন্দ্যর মনে হয় যেন তার, বাবুয়ার, সংসারের ব্যাপারে কোনও আবেগই নেই শিঞ্জিনির । সে যেন সবকিছুর থেকে একটু কোথাও দূরে সরে বসে আছে । কেন এ'রকম কে জানে, বাবা !

গাড়িটা বাড়ির সামনে পৌঁছতেই দ্রুত মাথা ঠান্ডা করে ফেলে অনিন্দ্য । আপনা থেকেই স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে ওঠে তার । খুব ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হবে পুরো ব্যাপারটা । শিঞ্জিনির আবেগের ঠিক জায়গাটায় ঘা দিতে হবে আজ । তা হলেই এরমাত্র অনিন্দ্য যা চাইছে, তা হবে ।

লিভিং রুমে বসে একটা বই পড়ছে শিঞ্জিনি, ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলো অনিন্দ্য । সে পায়ে পায়ে শিঞ্জিনির সামনে দাঁড়িয়ে ডাকটা দিল, ''শিঞ্জিনি, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো'' । শিঞ্জিনি বই থেকে চোখটা তুললো তার দিকে, চোখটা বেশ কিছুদিন পরে আজ যেন অনেকটাই প্রসন্ন । ''হ্যাঁ, অনিন্দ্য, আমারও একটা কথা বলবার আছে তোমায় । আমিই বরং আগে বলি । অনিন্দ্য, আমি দেশে ফিরতে রাজী, তুমি বন্দোবস্ত করো'' ।

অনিন্দ্য বেসামাল হয়ে গেলো ভেতরে ভেতরে আরে ! হঠাৎ কি হলো ? রাজী হয়ে গেলো যে হঠাৎ !? যাক গে তার অত কার্যকারণ জানতে চাওয়া দরকার নেই । নিশ্চয় অনুতাপ হয়েছে । তার কাজটা তো হয়ে গেছে । তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে জিজ্ঞাসা করল, ''are you sure ?'' বইয়ে চোখ ফেরাতে থাকা শিঞ্জিনির দিক থেকে ছোট্ট জবাব ভেসে এলো, ''হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।''

একটা নরম রোদ তেরছা ভাবে পড়েছে হালকা বেগুনী টেবিলটায় । তাতে মসৃণ টেবিলটা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর সেই উজ্জ্বলতার প্রতিফলন হচ্ছে শিঞ্জিনির চিবুকে, নাকের নীচে, ডান গালের উপত্যকায় । শিঞ্জিনির দৃষ্টি ভাসিয়ে রেখেছে কাঁচের জানালার ওপারের খোলা আকাশটায় আর সোম, না, না, নীল দৃষ্টিটি নিবন্ধ করে রেখেছে । শিঞ্জিনির ভাসানো চোখে । তার ভালো লাগছে শিঞ্জিনিকে দেখতে, তার ভালো লাগছে এই নীরব অথচ বাঙ্ময় মুহূর্তটা, তার ভালো লাগছে গত দু'মাস ধরে বয়ে চলা জীবনের এই কল্পনাতীত পর্বটিকে ।

সেদিন তথাগত'র বাড়িতে পিছন ফিরে স্থির হয়ে গিয়েছিল নীল । সে ভাবতেও পারেনি যে জীবনে আর কখনও শিঞ্জিনির সঙ্গে এ'ভাবে দেখা হয়ে যাবে তার । শিঞ্জিনি তো তার জীবনে বয়ে যাওয়া এক অধরা স্বপ্নই ছিলো যাকে সে এ'পৃথিবীর অজান্তে সযত্নে পুষে রেখেছিলো বুকের গভীরে ঠিক যেভাবে মানুষ লুকিয়ে রাখে তার দুর্দান্ত সম্পদ । শুধু একাকী সময়গুলোতে, যখন সৃজনশীল বলে টুপটাপ খসে পড়তে থাকে মৃত তারাদের শব, নীল বের করে আনত শিঞ্জিনিকে । হু হু বাতাসে মেলে ধরত তাকে, শিঞ্জিনিকে ঘিরে থাকা তার অনুভূতিরা বাধ্য কাগজের টুকরোর মত সে হাওয়ায় উড়ে গিয়েও আবার ফিরে ফিরে আসত তার মনের কোটরে, নিজের অজান্তেই সময়হীন, অবয়বহীন এই ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা খেলত সে শিঞ্জিনির সঙ্গে, নিজের মনেই । এ'সব কথা সে বলেছে সেদিনের পর আবার দেখা হওয়া শিঞ্জিনিকে । সেদিন বেশী কথা হয়নি তাদের কারণটা সে জানেনা – হয়তো পরিবেশ, হয়তো ঘটনার আকস্মিকতা, হয়তো মনের কোণে বয়ে চলা যৌবনোচিত দ্বিধা । শুধু মোবাইল নম্বর আর টুকটাক কিছু কথাই বিনিময় হতে পেরেছিলো তথাগত-র বাড়িতে সেদিন । কিন্তু তারপর যেদিন প্রথম দেখা হলো তাদের, এমনই এক মহুয়া ঝিম গোধূলিতে, সেদিন আর নিজেকে বেঁধে রাখেনি নীল । তথাগত-র বাড়িতে সোমের খোলস থেকে নীলকে মুক্তি দিতে পারেনি সে । কিন্তু সেই গোধূলিতে নিজেকে উজাড় করে । দিয়েছিলো নীল । সময়ের খাতার হলদে পাতা থেকে সে তুলে নিয়ে এসেছিলো ফলতা আর বেহালার নির্জন পথের চিরসবুজ সেই নীলকে, তার বুকে মিশিয়ে দিয়েছিলো সাহস, যে সাহস ঠিক সময়ে ঠিকভাবে মেশাতে পারলে আজ, নীল জানে, অন্যতর হত তার জীবন ইতিহাস ।

সেদিন ভারী বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো শিঞ্জিনিও । তার মনে হয়েছিলো স্বপ্নরা হৃদয়ের গোপন খাঁজ থেকে মাথা তুলে এভাবে সত্যি হয়ে দাঁড়াতে পারে মানুষের স্বপ্নে । নীলের সঙ্গে এ' ক'বছরে মনে-মনে কত সময় কাটিয়েছে সে । তার জীবনে তমাল এসেছে, অনিন্দ্য এসেছে, দামাল ঝড়ের মতো এসেছিলো কেভিন – সব ঝড়, সব আগমণ সামলেও সে মনের মধ্যে কেন জানে রেখে দিয়েছিলো সেই যুবকটিকে যে, দেখলেই মনে হত, অনেকটা তারই মতো । অন্য যারা তার জীবনে এসেছে হয় তারা শিঞ্জিনির খাপে খাপ খাওয়াতে চেয়েছে নিজেদের অথবা কোনও বাধ্যতায় শিঞ্জিনি তাদের । একমাত্র নীলই ছিল, যার সঙ্গে নিজের বৃত্তের পরিমাপ না মিলিয়েও শিঞ্জিনি জানত, এ' পরিমাপ অপ্রয়োজনীয় পরিমাপের সাফল্য এ'ক্ষেত্রে

অবশ্যম্ভাবী। কেবল সে প্রচেষ্টাটিই করা হয়ে উঠেনি সময় মতো এই যা। নীলের মতো শিঞ্জিনিও সে গোধূলিতে ঢেলে দিয়েছিলো নিজেকে, তারপর এক এক করে নিজের আবেগের খন্ডগুলোকে হাতে তুলে নিয়ে নীলের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরে যেন বলেছিলো, এই দ্যাখো নীল, এ'সব তোমার, এ'সব তোমারই জন্য তুলে রাখা সযত্নে, এ' আর কাউকেই দেওয়া যায়নি, এ' আর কাউকেই দেওয়া যায়না।

এরপর আরও তিন-চারবার ফোনে কথা হয়েছে তাদের। মন ভরেও মন ভরেনি শুধুমাত্র কথায়। দেখা করতে ইচ্ছা করে উঠেছে ভীষণ। তাই আজ আবার তারা এই নরম আলোয় পরস্পরের মুখোমুখি, পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত, উন্মুখ।

আকাশ থেকে নীলে চোখ রাখলো শিঞ্জিনি, ''আচ্ছা নীল, ভালোবাসা কি ?'' নীল মুখে কিছু না বলে নিজের ডানহাতের তর্জনী দিয়ে ছুঁয়ে দিতে লাগল শিঞ্জিনির বাঁ হাতের কনিষ্ঠাটিকে। আলতো-আলতো করে যাতায়াত করাতে লাগলো তার আঙুল শিঞ্জিনির আঙুলে যেন এ' যাতায়াতেই সব কথা বলে দিচ্ছে সে।

ভালো লাগছিল শিঞ্জিনির। পুরুষের কোনো আদরে নাম থাকেনা, থাকে স্নেহ, থাকে নিখাদ ভালোবাসা আর সাহচর্য, থাকে বারবার নিরুচ্চার বলা আমি আছি। নারীর ভারী প্রিয় পুরুষের আদরের এ' ভাষা। কিন্তু ক'জন পুরুষই বা এটা উপলব্ধি করে ? পুরুষ ভাবে, নারীর স্তনে, ওষ্ঠে, কানের লতিতে, জঙ্ঘায় বোধহয় ভালোবাসা থাকে। সে'সব দুমড়োলে-মুচড়োলেই বোধহয় ভালোবাসার সন্ধান মেলে। ভুল, পুরুষ, এ' তোমার চরম ভুল। অনিন্দ্য অগুনতিবার তার স্তন ছুঁয়েছে, খেলা করেছে উত্তুঙ্গ ঐ দেহাংশ নিয়ে, কখনও তো খুঁজে দেখেনি ঐ মাংসপিন্ডের পিছনে, ঐ চামড়ার আবরণের অন্তরালে যে হৃদয় আছে, তাকে। আজ নীলের এই সামান্য স্পর্শ ভালো লাগছিলো শিঞ্জিনির। সে বুঝতে পারছিলো, তার আঙুল ছুঁয়ে নীল গিয়ে বসতে চাইছে তার হৃদয়ের পাশটিতে।

— ''জানো শ্রী'', নীল হঠাৎ বলে উঠল, এখন শিঞ্জিনিকে শ্রী বলে ডাকতে ভালো লাগে তার। শিঞ্জিনি শ্রী রাগের মতোই সুন্দর, সতেজ। ''৯৩ সালে একটা দুই বাংলার যৌথ কবিতা পাঠের আসর হয়েছিলো আমি সেখানে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু....''

''হ্যাঁ মনে আছে। '৯৩ সালের ৫ই মার্চ, রবীন্দ্রসদনে হয়েছিলো।''

নীলের কথার মাঝেই তথ্যটা এগিয়ে দেয় শিঞ্জিনি।

— ''তুমি.... তুমি কি গিয়েছিলে শ্রী, ওখানে ?'

— ''নাঃ যাওয়া হয়নি। আর তাই দেখা হয়নি সুনীলকে। সেবার সুনীল ছিলো, শক্তি ছিলো, জয়.....

— ''হ্যাঁ, বাংলাদেশের থেকে সামসুল হক....। আসলে, তোমার আবার সুনীলকে দেখার কথা ছিলোনা বোধহয়।

কিছু কিছু দেখা থাকে শ্রী, সেখানে চোখে দেখতে পাওয়াটা গেনি, এক অন্য দৃষ্টি দিয়ে মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যায় অহরহ। যেমন, তোমার আর আমার সুনীলের বেলায় হয়েছে।''

— ''হ্যাঁ, তাকে দেখিনি কখনও। কিন্তু তার কবিতায় যে জীবনবোধ, মানুষের অন্তরের প্রতি যে, তীব্র, যে একটা গোটা ও প্রকৃত মানুষের বিচরণ - তা সারাজীবন বয়ে বেড়িয়েছি মনের মধ্যে'', শিঞ্জিনি আনমনা হয়ে উঠতে থাকে, ''আর সেটাই বোধহয় প্রতিদিন মরে যাওয়ার মাঝেও একটু বাঁচিয়ে রেখেছে আমায় আলাদা করে''।

— ''হ্যাঁ, তখন জানতে চাইছিলে না শ্রী, ভালোবাসা কি ? ভালোবাসা তো আর কিছুই নয়, শুধু এক তীব্র অনুভূতি। ভালোবাসা মানুষের দেহে বসবাস করে না, করে মননে। এর কোনো চেহারা নেই, কোনো বাস্তবিক স্পর্শ নেই, নেই কোনো চাহিদা। ভালোবাসা তো কিছু পাওয়ার জন্য নয়, ভালোবাসা মানে, দেওয়া, শুধু দেওয়া। সেই যে সুনীল বলেছিলো,

''ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবন্ধ অভিযান, চোখ জ্বালা করে ওঠে''

— ''হ্যাঁ, জানো নীল, এই চোখ জ্বালা করে ওঠাটাই আসল। বুকের মধ্যে তীব্র ঘূর্ণনে পাক মারতে থাকে আবেগ, হু হু করে বয়ে যায় ভিনদেশী এক হাওয়া, আশ-পাশের যান্ত্রিকতা প্রতি মুহূর্তে টেনে নামাতে চায় তার নিজস্ব সংকীর্ণতায়, তখন শুধু ভালোবাসার অনুভূতিকে বুকে আঁকড়ে ধরে চোখ জ্বালা করে ওঠে। এ'জীবনে যে কতবার নীল . . . কতবার ভালোবাসা চেয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। অন্য কিছু তো নয়, আমি তো সোনা-দানা গয়না-গাটি, গাড়ি-বাড়ি চাইনি, ও'সবে তো আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না কখনও, আমি শুধু চেয়েছিলাম একটা মন, যে আমার মনের সংবেদনশীলতা, নিজস্বতাকে বুঝবে, সম্মান করবে, যে মন নিঃশর্তে হাঁটবে আমার পাশে পাশে বৃষ্টি ভেজা পথে, যে মন আমাকে অহরহ, প্রতি নিয়ত, প্রতি মুহূর্ত বলে যাবে যে ভালোবাসা এক বহতা নদীর নাম, ভালোবাসা এক পবিত্রতম অনুভূতি, ভালোবাসাই ঈশ্বর'' আবেগে সারামুখ লাল হয়ে ওঠে শিঞ্জিনির। দু-চারটে চুল ইতঃস্তত এসে পড়েছে শিঞ্জিনির কপালে, চোখ দুটো যেন সময়ের জানালার কাঁচ ভেদ করে বয়ে চলেছে তমসা নদীর মতো, শিঞ্জিনির ওষ্ঠে যেন আকুলতা আর অসহায়তা মিলে মিশে যাচ্ছে। বড় কাছের, বড় আপন মনে হচ্ছে শিঞ্জিনিকে নীলের।

— ''শ্রী, তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি, নেবে ?'' নীল প্রশ্ন করে।

— ''কি উপহার নীল ?''

— ''এই যে এটা'', দুধসাদা গোলাপের কুঁড়িটা শিঞ্জিনির দিকে এগিয়ে দেয় নীল। ভারী সুন্দর কুঁড়িটি, তার পাপড়িগুলো এখনও দলবদ্ধ, যেন পরস্পরকে ছেড়ে যেতে মন চাইছেনা তাদের, অথচ প্রতিটি পাপড়িই এমন উন্মুখ যেন তারা জানে যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়াটা ওদের অন্তিম নিয়তি। মানুষ মানুষকে আঁকড়ে থাকে তো এ'ভাবেই। এক সঙ্গে থেকেও ভিন্ন ভিন্ন থেকেও একাত্ব।

— ''ভারী সুন্দর, এ' আমি সারাজীবন রেখে দেবো নীল।'' একটু চুপ করে থাকে শিঞ্জিনি, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, ''নীল, তোমার সঙ্গে একবার ফলতার এক আশ্রমে গিয়েছিলাম আমি। ভীষণই ভালো লেগেছিলো ওই হঠাৎ যাওয়াটা। আমাকে আরেকবার তোমার সঙ্গে ঐ আশ্রমে, ঠিক ওইরকম বাসে চেপে নিয়ে যাবে নীল ?''

— ''তোমার মনে আছে শ্রী ? তুমি সত্যিই যাবে আমার সঙ্গে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি মহারাজের কাছে। ভারী ভালোমানুষ উনি, গেলেই এত আন্তরিকতা . . . ., কবে যাবে শ্রী ?''

হেসে ফেলে শিঞ্জিনি। হঠাৎই একটু ছেলেমানুষ হয়ে উঠে নীলের মাথার চুল নেড়ে দেয় সে, ''বলি, নীলবাবু, কবে যাবো সেটা আমি বলব ? আমি তোমার উপর নির্ভর করলাম। তুমি তো বলবে, কবে যাবো ?'' হাসতে হাসতেই যোগ করে শিঞ্জিনি, ''এ্যাই নীল, তুমি এখন সোমদত্ত সেন দ্য গ্রেট হয়েছো বটে, কিন্তু একদম ছেলেমানুষ রয়ে গেছো এখনও। তুমি আসলে সোমদত্ত-টত্ত কিছু নও, তুমি একটা . . . . তুমি একটা . . . . তুমি একটা . . . . মিষ্টি গাধা''।

— ''আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, শ্রী'' হঠাৎ গভীর গলায় নীল বলেও দুড়মুড় করে নিমেষে ভেঙে পড়তে থাকে শিঞ্জিনি। তার মনে হতে থাকে প্রবল এক ঝড় তাকে ছিটকে নিয়ে গিয়ে ফেলছে এক বিশাল খোলা প্রান্তরে। সেখানে আর কিছু নেই, শুধু সে আর আরেক প্রাণ। আশ-পাশ ভুলে নীলের হাতে হাত রাখে শিঞ্জিনি, বলে, ''জানি, আমি জানি নীল, বুঝি। বুঝতাম . . . . . চিরদিন ই''।

মাটির রাস্তাটায় পা রেখে দাঁড়াতেই হু হু করে একটা বাতাস এসে ঝাপটা মারল শিঞ্জিনির মুখে। ভারী ভালো লাগল এসে দাঁড়াতেই নদীর এই আলিঙ্গন। একটু দূরেই বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। মাঝে দূরত্ব বলতে কেবল কাদা বুকে পড়ে থাকা একটু জলা ভূমি। এই দূরত্ব সত্ত্বেও শিঞ্জিনির বুঝতে অসুবিধা হয়না, এ হাওয়া ঐ নদীই পাঠিয়েছে তাকে। মুখ ঘোরাতেই নাকে

এল আরেক মিষ্টি গন্ধ। বড় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীল। তারই গালের আফটার শেভ ছড়াচ্ছে এই ভালো লাগাটা। আজ নীলকে দেখতে খুব ভালো লাগছে শিঞ্জিনির। সামনের জমি, বয়ে যাওয়া নদী — সব পার করে নীল তার চোখ দুটো ভাসিয়ে রেখেছে যেন আরও দূরে কোথাও। নীলের বুকে আলতো হাত রাখে শিঞ্জিনি, ''কি দেখছো নীল ?''

নীল তার চোখ দুটোকে নামিয়ে আনে। রাখে শিঞ্জিনির চোখে। বাতাসটা ঝিরঝিরিয়ে বইছে এখন। একটা খেঁজুর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে তারা। রাস্তাটা এখান থেকে নতুন একটা বাঁকে বেঁকে যাবে। রাস্তার অন্য দিকের চাষ জমিটায় পড়ে থাকা আল হেলে-দুলে পেরোচ্ছে পাতিহাঁসের দল। বোধহয় জলে যাবে। নীলের হাত দুটো উঠে এল শিঞ্জিনির কাঁধে। শিঞ্জিনিকে কাছে টানছে নীল। খেঁজুর পাতার জাফরি দিয়ে রোদের আনমনা ভাব এসে পড়ছে দেহ দুটোতে। নীল তার ঠোঁট নামালো শিঞ্জিনির ঠোঁটে। প্রথমে আলতো, তারপর গভীর আশ্লেষে। নীলের বাঁহাত এখন শক্ত করে ধরে রেখেছে শিঞ্জিনির মাথার পিছন। চরম আবেগে শিঞ্জিনির পিঠ ঘষটে যাতায়াত করছে ডানহাত। শিঞ্জিনি সমর্পণ করল নিজেকে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল নীলের পিঠের উপরিভাগ। ভীষণ ভালো লাগছে তার, একটা অপার্থিব অনুভূতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে শিঞ্জিনির মননে, শরীরে। তারও নীলকে কিছু দিতে ইচ্ছা করছে এখন, প্রবল বাসনায় সে তার ঠোঁট গুঁজে দিল এবার নীলের মুখের ভিতর। সময় তার নিজস্ব নিয়ম পরিত্যাগ করে থমকে দাঁড়িয়েছে, হাওয়াদের দুষ্টুমিও শান্ত হয়ে এসেছে, একখন্ড কালো মেঘ নদীর দিক থেকে এসে চলে যাচ্ছে চাষজমি আর আল পেরিয়ে, দুটি মধ্যবয়স্ক নারী-পুরুষ জীবনের সমস্ত না পাওয়াকে সে মেঘে ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অপরের মধ্যে, জীবনের সবটুকু পাওয়া নিয়ে। আজ আর কিছু পাওয়া বাকি নেই তাদের। চুম্বন নিছক ওষ্ঠে ওষ্ঠ সমর্পণ কখনও কখনও কাম, বাসনা, শারীরিক মিলন পার করে হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য এবং কাম্য স্বীকৃতি, এক বৃত্তের পূর্ণ হওয়ার নিশান। এক সময়ে এই দুটি নারী-পুরুষ পরস্পরের ওষ্ঠ ছেড়ে ভালোবাসা রাখে দুজনে দুজনের চোখে। সমস্ত আগামী সম্ভবনাকে সে দৃষ্টি বিনিময়ে ধরে একসঙ্গে বলে ওঠে, ''চলো''। তারপর পা বাড়ায় মহারাজের আশ্রমের দিকে। আজ অনেক বছর পরে আবার একসঙ্গে ফলতায় এল তারা।

নীলকে দেখা মাত্রই ভারী খুশী হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী। বড় স্নেহ করেন এই ছেলেটিকে তিনি। সেই প্রথম যৌবন থেকে ছেলেটি আসে তার কাছে। ওর জীবনের গতি ওঠা-পড়া সব খবরই রাখেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁর ভালো লাগে এই ভেবে যে ছেলেটি জীবনের এত বিবিধ ও বিচিত্র গতিধারাতেও নিজের ভিতরটিকে ঠিক রাখবার চেষ্টা করেছে অনেক মানুষই তো এখানে আসে। কেউ আসে নিজের দুঃখ-কষ্টগুলোকে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। তাদের আসলে একটা ধারণা আছে যে ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান বলে পরিচিত, অত এব তার ঘাড়ে সব ভার রাখা যায়। এই মূর্খরা বোঝেনা যে ঈশ্বর অনায়াসেই সে ভার নিতে পারেন, সেটি তাঁর কাছে কোনও সমস্যাই নয়, আসলে তিনি জেনে বুঝেই মানুষের ঘাড়ে দায়িত্ব, কষ্টগুলো দিয়েছেন। তিনি মানুষকে যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন বলেই এ' দায়িত্ব দিয়েছেন। এ' দায়িত্ব তাঁকে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ, ঈশ্বরের ভরসাকে অমর্যাদা করা, ঈশ্বরকে অপমান করা।

আরেক ধরণের প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা আসেন, যাঁরা ভাবেন যে দান-ধর্ম করাটা করুণার ব্যাপার। তাঁরা যে সাহায্যটা করছেন সেটা যথেষ্ঠ অথবা যথেষ্ঠর চেয়েও বেশী। এনারা বোঝেন না যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে কোনও কিছুই যথেষ্ঠ নয়। কারণ তিনি স্বয়ং অনন্ত। এই জাতীয় মানুষদের আরেকটা প্রবণতা দেখেছেন সন্ন্যাসী। এনারা ঈশ্বরকে কিছু দেন, কিছু পাবেন বলে। এনারা অর্থের বিনিময়ে পুণ্য চান। বোঝেন না যে পূণ্য কেনা যায় না, নিরন্তর সৎকাজ ও সম্পর্ণেই আপনা আপনি জমা হতে থাকে পুণ্য। বোঝেন, সবই বোঝেন সন্ন্যাসী। তবু চুপ করে থাকেন। মানবহিতে যেসব কর্তব্য তিনি হাত পেতে নিয়েছেন, তারজন্য আর্থিক বলের বড় প্রয়োজন।

নীল ছেলেটি অমন নয়। ও আসে, আসার জন্যই। আরে, ওর সঙ্গে একটি নারী। সেই মেয়েটি না, যে অনেকদিন আগে নীলের সঙ্গে একবার এসেছিলো তার এখানে ? হ্যাঁ সেই। সেবার মুখে কিছু বলেননি সন্ন্যাসী। কিন্তু দুটিকে দেখে রাধা-কৃষ্ণের মতো লেগেছিলো তাঁর। সন্ন্যাসী বুঝেছিলেন, মানুষ দুটি দুজনকে বেশ পছন্দ করছে মনে, মনে, হয়তো প্রকাশ করে উঠতে পারছেনা। ওরা নিজেরাও হয়তো সেদিন বোঝেনি যে একটা চোরা টান জমাট বাঁধতে চাইছে ওদের দুটো মনের মাঝে। সন্ন্যাসী মুখ টিপে হেসেছিলেন সেদিন, ভেবেছিলেন মনের কি বিচিত্র গতি। ভেবেছিলেন, এরা পরস্পরকে বুঝতে

পারলে বেশ হয়। যদিও পরে বুঝেছিলেন, যে কোনও কারণেই হোক দানা বাঁধেনি এ’ আবেগ। তিনি সন্ন্যাসী, ঈশ্বর নিয়ে তাঁর কারবার তবু মানুষের মন, প্রেম এ’সব নিয়েও ভাবতে ভালো লাগে তাঁর। কাম আর নির্মল প্রেমের পার্থক্য আছে। নির্মল প্রেমে ঈশ্বরকে খুঁজে পান তিনি। তাঁরই আশ্রমে হারু আর মিনতি বলে এক গ্রাম্য দম্পতি সামান্য কিছু সাহায্যের বিনিময়ে শ্রমদান করে। অনেক গ্রীষ্মের দুপুরে নিজের কক্ষ থেকে বিশ্রাম নিতে নিতে তিনি দেখেছেন হারুর পিঠের ঘামাচি সযত্নে মেরে দিচ্ছে মিনতি, আর তারপরই মিনতির গালে আলতো চুম্বন এঁকে দিচ্ছে হারু এদিক-ওদিক নজর করে। সন্ন্যাসীর ভালোই লাগে। ভালোবাসা তো অতি পবিত্র বস্তু। ভালোবাসা ছাড়া তো আজ পর্যন্ত কেউ ঈশ্বরের পৃথিবীতে বড় কোনও কাজ করে উঠতে পারেনি। নীল আর মেয়েটিকে একসঙ্গে আসতে দেখে তাই বড়ো ভালো লাগল সন্ন্যাসীর। এতদিনে মনে হচ্ছে জমাট বেঁধেছে আবেগটা। ওদের চলায়, সান্নিধ্য রচনায় সেটা টের পেলেন সন্ন্যাসী। তাঁর ভালো লাগল।

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে নদীর বুকে। পশ্চিম দিক থেকে উঠে আসা একটা আলো ভরিয়ে দিচ্ছে আশ্রম প্রাঙ্গন। একটা চাটাইয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী, সামনে নীল আর শিঞ্জিনি।

— ‘‘মহারাজ, আপনার এই উদ্যোগ অতুলনীয়। আপনি যা করতে চাইছেন বা চলেছেন তা সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। আমি আপনার এই উদ্যোগে নিজেকে মেশাতে চাই’’, শিঞ্জিনি বলল।

— ‘‘বেশ তো, কিন্তু কি ভাবে তা করতে চাও, বলো তো মা?’’ স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী। উত্তরটা এল নীলের দিক থেকে, ‘‘মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে একটা বড় চাকরি করবার সুবাদে অনেকে চেনে আমাকে। শ্রীও আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আমরা দরকারে দরজায় দরজায় ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে আনবো আপনার প্রস্তাবিত অনাথ আশ্রমের জন্য’’।

— হ্যাঁ, তাছাড়া নিয়মিত আসবো এখানে, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমরাও গড়ে তুলবো এই অনাথ আশ্রম’’।

— ‘‘ব্যাস?’’ মিষ্টি হাসিতে রহস্য ছড়ান সন্ন্যাসী।

নীল, শিঞ্জিনি থমকে যায়। বোঝেনা, কি বলতে চাইছেন মহারাজ। তাহলে কি আরও বড় আকারে তাদের সম্পৃক্ত হওয়া চান তিনি উনি?

সন্ন্যাসীই পরিস্কার করেন তার উদ্দেশ্য। বলেন, ‘‘শুধু এই গড়াতেই তো নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ ভাবলে চলবেনা নীল, শিঞ্জিনি। তোমাদের মধ্যে যে আমি আরও বিস্তারের সম্ভবনা দেখছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। এখন পরিকল্পনা যত করতে পারি, স্বপ্ন যত দেখতে পারি, পথ যত দেখাতে পারি, তত তো আর চলতে পারিনা। পথ চলবার দায়িত্বটি যে তোমাদেরই নিতে হবে। এ’ আশ্রম প্রস্তুত হয়ে গেলে পরিচালনার মূল দায়িত্বও যে তোমাদের নিতে হবে।

— ‘‘পারবো এ কাজ আমরা?’’ শিঞ্জিনির গলায় সংশয় ও অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির মেলবন্ধন ফুটে ওঠে।

সস্নেহে তাকান সন্ন্যাসী, ‘‘পারবে। পারবে বলেই তো তোমাদের বলা। তোমরা যে পারবার জন্যই। তোমরাও যদি না পারো, তবে তো এ’কাজ আর কেউ পারবে না শিঞ্জিনি মা। কি নীল, পারবেনা?’’

আবেগে সন্ন্যাসীর পায়ে, হাত রাখে নীল। হ্যাঁ, পারবে। পারবেই সে। পারতেই হবে। শ্রীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা বড় কাজ করে যাবে সে। ভালোবাসা মানে তো এই-ই, নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। হালকা একটা কমলা আলো এখনও ছড়িয়ে আছে পথে ঘাটে, চাষের মাঠে। হেঁটে ফিরে যাচ্ছে দুটি নারী-পুরুষ, পাশাপাশি, সংঘবদ্ধ। তাদের এ’ ফিরে যাওয়ার আজ এক অন্য দীপ্তি। তারা ফিরে যাচ্ছে আবার ফিরে আসবে বলে। তারা ফিরে যাচ্ছে জাগতিকতায়, অজাগতিয়তার জন্য নতুন রসদ সাংগ্রহে। আজ তারা নির্ভিক-

প্রত্যয়ী। নতুন জীবন পথের সন্ধান এই দুটি মানুষের চোখে। দূর থেকে দুজনকে লক্ষ্য করছেন এক সন্ন্যাসী। তিনি জানেন, যা অনেকদিন আগে হতে পারত, তা আজ হল। দুটি প্রাণ বাঁধা পড়ে গেল এক মহান বন্ধনে। আর ভয় নেই ওদের, ওরা এখন থেকে নিঃশঙ্ক। একসময়ে সন্ন্যাসীর দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল অগস্ত্যকাল দুটি ছায়া অবয়ব। তাদের হেঁটে যাওয়া পথে কমলায়-মেটে রঙে পড়ে রইল কেবল কিছু স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নের হাত ধরে প্রতীক্ষায় থাকা অনন্ত, আশ্চর্য্য এক সময়।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার ‘খেলার ছলে’ পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই ‘দেশ’, শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৮

(১১)

পরেরদিন থেকে শুরু হলো কানাডায় বসবাসের প্রথম পর্ব।

সকাল দশটার মধ্যে সুশোভন আর শুচি পৌঁছে গেলো ইমিগ্রেশনের অফিসে।

এদেশে সবার, সবকিছুর record থাকে – "বেহিসাবী" একজন মানুষও এখানে পাওয়া যাবে না। এদেশের নাগরিক মানেই তোমার একটা সোশ্যাল ইনশিওরেন্স নাম্বার, অর্থাৎ SIN, থাকবে – আমেরিকার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের মতো। ঐ নাম্বারটাই তোমার পরিচিতি, তোমার এদেশে থাকার বা কাজ করার ছাড়পত্র, এবং ভিড়ের থেকে তোমাকে খুঁজে পাওয়ার উপায়।

তুমি যদি কোনো বেআইনী কাজ করো বা ব্যাঙ্কের থেকে টাকা ধার নিয়ে শোধ না দাও – সব লেখা হয়ে যাবে তোমার SIN-এর against এ। এবার তুমি যেখানেই যা করতে যাও, তোমার SIN ঢোকালেই computer-এর পর্দায় উঠে আসবে যাবতীয় পুরোনো তথ্য। আর SIN না দিয়ে এদেশে কোনো কাজই তুমি করতে পারবে না।

অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যত ইচ্ছে গোপনীয়তা পালন করো না কেন, কেউ তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দেবে না; কিন্তু বহির্জীবনে তুমি যা করবে তা বইয়ের খোলা পাতা, এবং তোমাকে সেই কাজের পুরো দায়িত্ব নিতে হবে। কাগজপত্র দেখে, বুঝে, সব করে যখন বেরোলো দুজনে তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে।

শুচি বললো – "বাহ, সুন্দর system তো – SIN! এইজন্যেই বোধহয় corruption কম এদেশে। বাজে কাজ করে কেউ পার পাবে না এখানে।"

সুশোভন বললো – "তা পাবে না, ঠিক – কিন্তু তাইজন্যেই corruption কম, না এদের নৈতিক চরিত্রই একটু উচ্চমানের সেটা বলা মুস্কিল। ..... আর্থিক স্বাচ্ছল্যও একটা কারণ। দুটো পয়সার জন্য চুরি করার কথা ভাবার এদের দরকার হয় না।"

শুচি বললো – "আমাদের দেশে কেন এরকম একটা নাম্বার দেওয়া কার্ড করে না ? ... আছে এক শুধু রেশন কার্ড, তারও তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই।"

সুশোভন বললো – "উন্নত দেশে এরকম অনেক কিছু থাকে – তুমি যদি সব দেখেই ভাবতে বসো যে "আমাদের দেশে কেন এরকম করে না", তবে তো মুস্কিল। ..... আমাদের দেশেও হবে আস্তে আস্তে একটা tracking system ..... হতেই হবে, নাহলে সামাল দেওয়া যাবে না।"

এতো ঘোরাঘুরি করে ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।

সামনে একটা Chinese Restaurant দেখে দুজনে ঢুকে পড়লো। ওয়েটার পেছনদিকের একটা খালি টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালো ওদের। সুশোভন মেনু চাইতে সে এনে দিলো কিন্তু বললো যে মেনু দেখে খাবার order দিলে অনেক দেরী হবে – Lunch time এ এখন এখানে DIM SUM serve করা হচ্ছে, সবাই সেটাই খেতে এসেছে। দুজনের কেউই জানে না সেটা কি !

যে চাইনিজ মেয়েটি খাবার পরিবেশন করছিলো, তাকে সুশোভন বললো একটু বুঝিয়ে দিতে।

সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে যা বললো তার মানে হচ্ছে এই যে এরা ট্রেতে করে নানারকম তৈরী খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াবে – তোমার যা পছন্দ তুমি সেটা তুলে নেবে। টেবিলে কাগজ রাখা আছে, পরিবেশনকারী তাতে দাগ দিয়ে যাবে যে তুমি কি খাবার নিলে। সবশেষে তুমি কাগজটা নিয়ে কাউন্টারে যাবে – ওরা দেখে বলে দেবে যে তোমায় কত দাম দিতে হবে।

শুচি বললো – "বাহ, বেশ অন্যরকম তো! চলো, try করি!"

সুশোভন আন্দাজে দুটো খাবারের দিকে হাত দেখালো, মেয়েটি ট্রে থেকে দুটো গোল বাটি ওদের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেলো। প্রত্যেকটাতে চারটে ছোট ছোট ডাম্পলিং – প্রথম চারটের ভেতরে চিংড়িমাছের পুর, পরের চারটের ভেতরে পোর্ক অর্থাৎ শূয়োরের মাংসের পুর। "পোর্ক" শুনেই শুচি মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

সুশোভন বললো – "আরে খাও খাও – খেয়েই দেখো। এদেশের পোর্ক খুব ভালো quality-র। এদেশে যখন এসেছো তখন "যস্মিন দেশে যদাচার" – ঐসব Indian গোঁড়ামি ছাড়ো।" একটু ইতস্তত করে শুচি একটা মুখে দিলো, আর দিয়েই মুগ্ধ ! দারুণ খেতে। ঐ item-টা আরেক bowl order করলো শুচি। তার সঙ্গে এক বাটি beef dumpling আর এক বাটি ফ্রায়েড রাইস।

সুশোভন হেসে বললো – "Good! That's the spirit!"

পরেরদিন দু'জনে গিয়ে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুললো। তারপর শুরু হলো বাড়ী খোঁজা। অনেক খুঁজে একটা এ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ হলো। বেশ বড়োসড়ো একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে কয়েকটা বিল্ডিং। চারপাশে মখমলের মতো ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া লন। প্রতিটি বিল্ডিং-এ ঢোকার দরজার দু'পাশে মরশুমী ফুলের বাহার। দোতলার, এখানে বলে সেকেন্ড ফ্লোর, পূবমূখী আলোয় স্নান করা এ্যাপার্টমেন্টটাই বাছলো শুচি – সুশোভনেরও পছন্দ হলো।

এ্যাপার্টমেন্টের অফিসে কথা বলে, একবছরের কন্ট্রাক্ট সই করে, এ্যাডভান্স পেমেন্ট করে হোটেলে ফিরলো দু'জনে। সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে মুভ করবে। কিছু ফার্নিচারও লাগবে। চারটে চেয়ার-ওয়ালা ছোট একটা ডাইনিং টেবিল, মোটা গোদি-ওয়ালা কুইন সাইজের খাট এবং বালিশ-বিছানা, আয়না লাগানো বড়ো একটা ড্রেসার আর তিন ড্রয়ার-ওয়ালা ছোট আরেকটা ড্রেসার, বড়ো একটা সোফা, টিভি – ঘুরে ঘুরে এক এক করে সব কিনতে লেগে গেলো আরো দিন দশেক। সব জায়গায় বলা রইলো পরের মাসের চার তারিখে ডেলিভারি দেওয়ার জন্যে।

তারপর খোঁজ শুরু হলো গাড়ীর। ডিলারশীপে গিয়ে, সেকেন্ড হ্যাণ্ড একটা গধুফধ গাড়ী কিনলো সুশোভন – দাম কম কিন্তু জাপানি গাড়ীর কলকব্জা ভালো, দু'দিনে বিগড়োবে না।

একটু একটু করে চালাতেও শুরু করলো সকাল বিকেল, হোটেলের চারপাশে। দেশের থেকে ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স করিয়ে এনেছিলো সুশোভন, তাই এখানে আর নতুন করে ড্রাইভার স্কুলে গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে না – দেশের লাইসেন্সে ও আপাতত গাড়ী চালাতে পারবে। কিন্তু পার্মানেন্ট লাইসেন্স পেতে গেলে, কিছুদিনের মধ্যে থিওরি এবং প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা দুটোই পাশ করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষাটা সহজ, দুজনেই পাশ করে গেলো একবারে। কিন্তু রোড-টেস্টের পরীক্ষায় সুশোভন ফেল – এমনিতে সবই ঠিক ছিলো কিন্তু "প্যারালাল পার্কিং" এ এসে আটকে গেলো। এই জিনিসটা দেশে কোনদিন করতে হয়নি। রাস্তার ফুটপাথ ঘেঁষে একটা গাড়ীর ঠিক সামনে বা পিছনে নিজের গাড়ীটাকে পার্ক করা – এরা বলে প্যারালাল পার্কিং। তিন-চারবার চেষ্টা করতে করতে সময় কাবার।

“ওকে, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড ট্রাই এগেইন – কাম ব্যাক নেক্সট মান্থ” বলে হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেলো কানাডিয়ান অফিসার। “দূর শালা – ব্যাটারা সবাইকে বারবার পরীক্ষা দিইয়ে রেভিনিউ তোলে ... যতবার পরীক্ষা, ততবার ফি দাও !” রেগে গিয়ে বললো সুশোভন। ব্যাপার দেখে শুচি হাসতে আরম্ভ করলো – “আমি বাবা রোড টেস্টের পরীক্ষায় বসছি না ! তুমি পাশ করে ড্রাইভার হও, আমি বরং পরীক্ষা-না-দেওয়া রাঁধুনী হবো।” তাই হলো। বহু প্র্যাকটিস করে, প্যারালাল পার্কিং আয়ত্তে এনে, দু’মাস পরে কানাডিয়ান লাইসেন্স পেলো সুশোভন। আর শুচি, পরীক্ষাই দিলো না। পাবলিক ট্র্যান্সপোর্ট খুব ভালো কানাডায়, তাছাড়া দরকার হলে সুশোভন গাড়ী চালাবে – ওর কোনো শখ নেই এই সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাওয়া বিরাট রাস্তাগুলোয় অত স্পীডে গাড়ী চালানোর ! দেখলেই ভয় করে ওর।

পূব-দক্ষিণ খোলা দুই বেডরুমের এ্যাপার্টমেন্টে ততদিনে শুরু হয়েছে শুচি-সুশোভনের নতুন সংসার।

সবই নতুন সেখানে – ফার্ণিচার থেকে আরম্ভ করে জীবনযাত্রার ধারা। মিক্সিতে মসলা বাটা, চপিং বোর্ডে তরকারী কাটা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘর পরিস্কার করা, প্লাস্টিকের গার্বেজ ব্যাগে নোংরা ফেলা – কোনোটাই ঠিক আগের মতো নয়, কিন্তু বেশ নতুন রকমের ভালো।

তিনমাসের মাথায় শুচি ঢুকলো একটা কম্প্যুটার ক্লাসে আর মাস চারেকের মাথায় সুশোভন যেতে শুরু করলো কাজে।

দেশে যে ব্যবসাটা ছিলো, ঠিক সেইরকম ব্যবসা যে এখানে শুরু করা মুস্কিল হবে সেটা ও আগেই জানতো। অনেক ভেবে চিন্তে ও একটা লন্ড্রি-কাম-ড্রাই-ক্লিনিং কিনলো। এ’দেশে এগুলো চলে ভালো। খুব হাই-স্কিলড ব্যবসা নয়। অল্প খাটুনির, কিন্তু লাভজনক। সবচেয়ে বড়ো কথা, সারাক্ষণ মাথা ঘামাতে হবে না ব্যবসার ওঠাপড়া নিয়ে। হাতে সময় থাকবে জীবনটাকে উপভোগ করার – ঘুরে বেড়ানোর। কয়েকজন এদেশীয় সাদা কর্মচারী রেখে আর আশেপাশের পাড়ায় কিছু বিজ্ঞাপনের ফ্লায়ার ছড়িয়ে, “Bright Clean” ড্রাই ক্লিনারকে কয়েকমাসের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলো সুশোভন।

কাছাকাছি চার-পাঁচটা হোটেলের সঙ্গে চুক্তি করলো তাদের গেস্টদের জামাকাপড় overnight ধুয়ে দেওয়ার। সব মিলিয়ে বেশ ভালোই রোজগার হতে লাগলো। শুচিও ততদিনে কাজ শুরু করেছে, একটা ব্যাঙ্কের টেলার হিসাবে।

দু’বছরের মাথায় শহরতলীতে নিজেদের বাড়ী বানিয়ে, এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চার বেডরুম তিন বাথরুমের বেসমেন্ট-ওয়ালা বিরাট বাড়ীতে উঠে গেলো শুচি-সুশোভন। শুচি তখন প্রেগন্যান্ট আর সুশোভন তখন “Bright Clean”-এর দ্বিতীয় শাখা খুলেছে শহরতলীর পাড়ায়। দুটো দোকানই খুব ভালো চলছে।

প্রথমদিকে খুব ব্যস্ত থাকতো সুশোভন। এইধরণের বিজনেসে মালিককে অনেকটা জড়িয়ে থাকতে হয়। দু’টো দোকানের মধ্যে চরকিপাক খেতো বেচারা। শনিবারেও বিকেল চারটে অবধি দোকান খোলা থাকতো। দুই দোকানের ক্যাশের হিসাব মিলিয়ে, টাকা তুলে, দোকান বন্ধ করে, পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী আসতো ও। তারপর শুরু হতো উইকেণ্ড – তখন আর কোনো কাজ নয়। দু’জনে মিলে গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে পড়তো এদিক-ওদিক। বাইরে ডিনার করে রাত্রি আটটা-নয়টায় বাড়ী ফিরতো। মাঝে মাঝে গীটার নিয়ে বসতো সুশোভন। শুচি গলা মেলাতো – “জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ.....”।

খুব যত্ন করে baby-র জন্য ঘর সাজালো সুশোভন। বললো – “ছেলে-মেয়ে এইসব ভাবার দরকার নেই। অবশেষে আসছে আমাদের ভালোবাসার সন্তান, এই যথেষ্ট। ..... হলুদ রঙ দিয়ে ঘর সাজাবো – pink-ও না, blue-ও না।”

তাই হোলো। হলুদ রঙের পর্দায়, সাদা রঙের ক্রিবে, মিকি-মাউস ছাপের বিছানায় আর যত রাজ্যের খেলনায় ভ’রে উঠলো শিশুর ঘর। সুশোভন নিজেই সব করলো। শুচির তখন শরীর ভারী, তার ওপর কোমরে একটা ব্যথা হচ্ছে। রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, কিছু খেলেই অম্বল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীর প্রায় সব কাজই সুশোভন করছে – শুচি কোনোক্রমে সপ্তাহের রান্নাটা

করছে আর সেটুকুতেই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। Weekend-এ সুশোভন রান্না করছে, কিছু বেশী করে রান্না করে রাখছে। শুচি তখন আর বাইরের খাবার খেতে পারছে না, তাই বাড়ীতেই হাল্কা রান্না হচ্ছে।

যথাসময়ে জন্ম নিলো শুচি-সুশোভনের প্রথম সন্তান। বলা ভালো, প্রথম ও শেষ সন্তান। একটা complication হয়েছিলো শুচির প্রেগন্যান্সিতে, শেষ মুহূর্তে সিজার করে বাচ্চা ও মা'কে সুস্থ রাখা গেলেও ভবিষ্যতে আর মা হওয়ার সম্ভাবনা রইলো না শুচির। একটু মন খারাপ হলেও, সেটা নিয়ে আর বেশী ভাবলো না শুচি। নবাগত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলো। সুশোভনের তো কথাই নেই – আনন্দে আত্মহারা যাকে বলে।

এ'দেশের নিয়ম অনুযায়ী, জন্মের সার্টিফিকেট বানাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। নামও ঠিক হয়ে যায় তখনই। পরে যে পাল্টানো যায় না তা নয়, কিন্তু সেটা করতে গেলে এফিডেফিট লাগে। কে যায় অতো ঝামেলায়? তাই প্রথমদিনেই নাম নির্বাচনটা সেরে নিলো দু'জনে। সুশোভনের মতে, বিরাট বড়ো একটা বাঙালী নাম জুড়ে দিয়ে ছেলেকে ঝামেলায় ফেলার কোনো মানে হয় না। মা-বাবা তো নাম দিয়েই খালাস – নামটা বইতে তো হয় সন্তানকে ! "সুশোভন" নামটা যেমন ওর কর্মচারীরা কেউ উচ্চারণই করতে পারেনা, ও তাই সবাইকে বলে দিয়েছে ওকে 'শন্' বলে ডাকতে। ছেলে যখন কানাডায় বড়ো হবে, তখন কানাডিয়ানদের জিভে আসে এমন নাম দেওয়াই ভালো। অতএব ছেলের নাম রাখা হলো দেব, দেব সেন। একটা সুন্দর বাংলা মানেও রইলো, আবার কানাডিয়ানদের জন্য সহজতম 'ডেভ'ও হলো।

শুচি বললো – "ওমা, একটা ডাকনাম হবে না ওর ? শুধু 'দেব'?"

সুশোভন ছেলেকে কোলে নিয়ে বললো – "হবে না কেন ? দিলেই হবে ! কি ডাকনাম দেবে, বলো ?" শুচি খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে শেষে বললো – "না, তুমিই বলো। আমি তো আগেও নাম দিয়েছি, তুমি কখনো দাওনি। তোমাকে এবার তাই পূর্ণ অধিকার দিলাম।"

সুশোভন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো – "লাপ্পা ...... লাপ্পা কেমন হবে ? লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা গান শেখাবো ওকে, দেখো না !" শুচি বললো – "লাপ্পা ? মানে কি ?"

সুশোভন একটু হেসে বললো – "ডাকনাম হলো ভালোবাসার নাম, তার আবার মানে থাকতে হবে নাকি ? ..... বাপ্পার ভাই লাপ্পা, ব্যস্ ! বাপ্পারও মানে নেই, লাপ্পারও না !" শুচি একদম চুপ হয়ে গেলো, যেন অনেকদিন পরে একটা নিষিদ্ধ দরজা হঠাৎ কেউ খুলে দিয়েছে। সেই নিষিদ্ধ দরজাটা কিন্তু খোলাই রইলো তারপর থেকে। সুশোভনের মুক্ত মনের আকাশে একটু একটু করে পাখা মেলতে শুরু করা শুচিও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো সেই খোলা দরজাটায়। ওটাকে আর নিষিদ্ধ বলে মনে হতো না তখন। মনে হতো যে সারা বিশ্বেই তো এমন ঘটনা কতো ঘটছে, ওদের প্রতিবেশী লিজেরও তো এটা দ্বিতীয় বিয়ে – তাতে সঙ্কুচিত হওয়ার কি আছে !

শুচিও তাই একদিন হঠাৎ বলে উঠলো – "লাপ্পার চোখের কাছটা একদম বাপ্পার মতো না ?"

সুশোভন হেসে বললো – "ছ'মাসের বাচ্চার কোনখানটা যে কার মতো, সেটা বোঝো কি করে তোমরা মেয়েরা ? আমার কাছে তো একবছর বয়স অবধি সব বাচ্চাকেই একরকম দেখতে লাগে। তবে হ্যাঁ, বাপ্পার মুখটা যখন পুরো তোমারই মতো তখন chance আছে লাপ্পার সঙ্গে চোখে-চোখে মিল থাকার।"

লাপ্পা খুবই শান্ত। যাকে পশ্চিমী parenting book-এ বলে "terrible two", সেই বয়সে এসেও সে তেমন কিছু দুরন্তপনা কখনো করেনি। বাড়ীর পেছনের লনে ওকে ছেড়ে দিতো শুচি। লাপ্পা ঘুরে ঘুরে ফুল দেখতো বা কোনো প্রজাপতির পেছনে একটু ছুটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তো। দোলনায় দুলতে একেবারেই ভালোবাসতো না, Swing Set টা শুধু শুধুই কেনা হয়েছিলো।

শুচি মাঝে মাঝে বলতো – "বাব্বা! এর চেয়ে তো আমার মেয়েটাও বেশী গুণ্ডা ছিলো – ছয়মাস বয়সেই পারলে সে টেনে-হিঁচড়ে সব তোলপাড় করতো ! আর এটা ছেলে হয়েও নড়ে বসে না !"

সুশোভন বলতো – "No sexist comment, please ! ছেলে মেয়ে আবার কি ? মেয়ে হলেই শান্ত হতে হবে আর ছেলে হলেই গুণ্ডা হতে হবে নাকি ? এই করেই তো ভারতীয় সমাজ আমাদের মাথা খেয়েছে ! ঐরকম স্টিরিওটাইপড কিছু হয় না – যার যেমন জিন্ । লাপ্পা আমার জিন্ পেয়েছে – শান্ত হয়ে বসে গীটার বাজাবে ।"

লাপ্পার দু'বছরের জন্মদিনে সবাই মিলে Thousand Islands বেড়াতে গেলো । ছোট ছোট অনেকগুলো Islands এর সমষ্টি এই Thousand Islands – একসময় স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন এখানে । প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে । লঞ্চ সার্ভিস আছে – আইল্যাণ্ডের মাঝ দিয়ে ঘুরে বেড়ায় ।

ওরা শুক্রবার পৌঁছে, শনিবারটা সারাদিন সব ঘুরে ঘুরে দেখলো । সন্ধ্যেবেলায় ডিনার আর কেক দিয়ে লাপ্পার জন্মদিন পালন করা হলো । রবিবার সকালে ফিরে যাবে । লাপ্পাকে তৈরী করে, শুচি নিজেও তৈরী হয়ে নিলো । সুশোভনকে তাড়া দিলো তৈরী হয়ে নিতো । ওরা একটা স্যুইট বুক করেছিলো । দু'বার ডেকে সারা না পেয়ে, বাইরের ঘরে এলো শুচি – সুশোভন চোখ বন্ধ করে সোফায় বসে আছে ।

একটু চিন্তিত হয়ে শুচি এগিয়ে এলো – শরীর খারাপ নয়তো ? সুশোভন চোখ তুলে বললো – "মা মারা গেছেন, ইমেইল এসেছে । ১৪ দিন আগে মারা গেছেন, শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাবা আমাকে খবর দিতে বলেছেন ।"

শুচি স্তব্ধ হয়ে গেলো । একবছর আগে ওর নিজের মা মারা গেছেন – সেই খবরও এসেছিলো পাঁচদিন বাদে, দীপা মারফত । এরকমই একটা আকস্মিক ইমেইলের হাত ধরে । দীপা দেরীতে খবর পেয়েছিলো । একটা ফোন কল-ও করেনি শুচির আত্মীয়দের মধ্যে কেউ ।

যাঁরা এই ঠান্ডা ইমেইলগুলো পাঠানোর কারণ হোন, তাঁরা হয়তো বোঝেনই না যে বিদেশে বসে থাকা ছেলেমেয়েদের বুকে এগুলো শক্তিশেলের মতো এসে পড়ে । আর বুঝলেই বা কি ? যে যার নিজের ego নিয়ে আটকে থাকবে বলেই হয়তো মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসা !

এইসব ধাক্কাগুলো বুক পেতে নিতে নিতেই বোধহয় মানুষ ভেতরে ভেতরে ভেঙে যায় আর বাইরে হয়ে ওঠে শক্ত । চোখের জলও আর পড়ে না, কারুর দয়াপ্রার্থী হতেও আর ইচ্ছা করে না । সত্যিকারের পরবাসী হয়ে যায় মন । শুচি-সুশোভনেরও বোধহয় তাই হয়েছিল । সেইজন্যই হয়তো ঠিক তিনমাস বাদে যখন আরেকটা ইমেইল এলো সুশোভনের বাবার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে, দু'সপ্তাহের বাসী খবরের কাগজের মতো, সুশোভন শুচিকে খবরটা বলেই বেরিয়ে পড়লো দোকানের দিকে ।

লাপ্পার আড়াই বছর বয়সে শুচি আবার কাজ শুরু করলো । সুশোভনই বললো যে চাইলে শুচি আবার কাজ শুরু করতে পারে, লাপ্পা এখন potty-trained হয়ে গেছে – ওকে একটা মন্টিসরিতে দিলে ভালোই হবে । খেলবে, ঘুমোবে আর পড়াশোনা শিখবে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে । এ'দেশে অনেক মহিলারাই এইরকম চাকরিতে ব্রেক নিয়ে, তারপর আবার ফিরে যায় । কোনো অসুবিধে নেই তাতে । শুচিরও অসুবিধে হলো না । অন্য আরেকটা ব্যাঙ্কে কাজে ঢুকলো ও, বাড়ীর কাছে । ভোর সাড়ে সাতটায় ও চলে যেতো । সুশোভন লাপ্পাকে মন্টিসরিতে ছেড়ে, দোকানে চলে যেতো বেলার দিকে ।

শুচি সাড়ে চারটেতে কাজ থেকে বেরিয়ে পড়তো । তারপর সন্ধ্যেটা পুরো লাপ্পার সাথে ।

আশ্চর্য ! কি করে যে কোনো কথা না বলেই সুশোভন বুঝে নিতো শুচির কি প্রয়োজন ! শুচির প্রয়োজন ছিলো একটা মুক্ত আকাশের। শুচির দরকার ছিলো বাপ্পা আর বাপ্পার বোনকে নিয়ে কথা বলার। শুচির দরকার ছিলো নিজের মনের guilt-feeling থেকে নিজেকে মুক্ত করার। শুচির দরকার ছিলো ঐ পুরোনো জীবনটাকে মুছে না ফেলেও নতুন জীবনটাকে সহজভাবে নেওয়ার, উপভোগ করার। সুশোভন এতো অনাড়ম্বরে সেই রাস্তাটা খুলে দিয়েছিলো যে শুচি ওকে কোনদিন "ধন্যবাদ" বলারও অবকাশ পায়নি। কোনো নিয়মের বাঁধনে শুচিকে না বেঁধে, কোনো তারতম্য না করে, শুধু অগাধ বিশ্বাস আর ভালোবাসায় সুশোভন তৈরী করেছিলো শুচির নতুন ঘর। সুশোভন ওকে পৃথিবী দেখিয়েছিলো, ওর মনের দরজা খুলে দিয়েছিলো। সুশোভন ওর অতীতকে, ওর পুরোনো সংসারকে, খুব স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়েছিলো – আর শুচিকেও শিখিয়েছিলো অতীতের থেকে মুখ ঘুরিয়ে না থেকে, অতীতকে মেনে নিতে।

তাই বোধহয় দেশে ফিরে এসে এতো সহজে শুচি পুরোনো সংসারের খোঁজ করতে পেরেছিলো – মনটা যে ওর তৈরী হয়েই ছিলো ! একটু একটু করে সুশোভন ওর মনটাকে তৈরী করে দিয়েছিলো জীবনকে সহজভাবে মেনে নিতে – ভালো-মন্দ সবকিছু শুদ্ধু জীবনের সত্যটাকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে।

(১২)

লাপ্পা যতো বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো, ততোই ওর শান্ত স্বভাবটা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। খেলা-ধুলোর চেয়ে বই পড়তে বেশী ভালো লাগে ওর। এ'দেশে খেলাধুলোতে যোগদান করাটা বিরাট ব্যাপার, শুচি তাই চেষ্টা করে লাপ্পাকে ঠেলে পাঠাতে। কিন্তু ফুটবল লাপ্পার ভালোই লাগে না। সুশোভন বারণ করে বেশী জোর করতে।

এমনিতেও লাপ্পা একটু রোগা-দুর্বল শরীরের – সেইজন্যেও হয়তো আরও বেশী ঘরকুণো ও। একটু হাঁপানির টান ছাড়াও, ওর নানারকমের এ্যালার্জি আছে। সাধারণ দুধ ওর সহ্য হয় না, সয়াবীনের দুধ খায়। চিনেবাদাম এবং chickpeas বা ছোলা – এই দুটোতেও ওর এ্যালার্জি।

সবরকমের এ্যালার্জি টেস্ট করিয়ে তবে লাপ্পার ফুডচার্ট বানানো হয়েছে আর সেই ফুডচার্ট মন্টিসরি থেকে এলিমেন্টারি – সব স্কুলে লাপ্পার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। শুচি সহজে কোথাও একা যেতে বা খেতে দ্যায় না লাপ্পাকে।

মাঝে মাঝে বাবা-ছেলে গীটার নিয়ে বসে ছুটির দিনে। শুচিও রান্না ফেলে, এসে যোগ দ্যায়।

বাপ্পার গলায় সুর আছে – মাত্র চার বছর বয়সেই ও দিব্যি সুশোভনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত গায়।

সাড়ে ছয় বছর বয়সে লাপ্পা Indian Association-এর প্রোগ্রামে গিয়ে Jamaican Farewell আর "ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন-রঙীন" গাইলো, সঙ্গে গীটারে সুশোভন।

ঐটুকু বাচ্চার মুখে এতো ভালো গান শুনবে কেউ বোধহয় আশাই করেনি – হাততালি আর থামতেই চায় না। অনেকে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু বাঙালীও ছিলেন। বাপ্পার সমবয়সী কিছু ছেলে-মেয়ে ছিলো, তাদের মা-বাবারা উৎসাহ দেখালেন পরে যোগাযোগ করার। কয়েকজন ফোন নম্বর নিয়ে নিলেন, বললেন বাড়ীতে ডাকবেন।

শুচি আর সুশোভন ইচ্ছে করেই ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি এতোদিন। এখনো যে খুব যোগাযোগ রাখতে চায় তা নয়, তবে ভালোই লাগলো বহুদিন পরে বাড়ীর বাইরে বাংলায় কথা বলে। মাঝে মাঝে ফোন করে এর ওর বাড়ী মিট করা শুরু হলো। এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া শুরু হলো। লাপ্পার জন্যই আরো বেশী করে, নিজেদের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক হতে শুরু করলো সুশোভন-শুচি।

রীতা-অমিতের বাড়ীতে গেট-টুগেদার ছিলো সেদিন – ওদের মেয়ে একদম লাপ্পার বয়সী, দু'মাসের ছোট।

শুচি-সুশোভন ছাড়াও ছিলো, অসীম-রুমা আর ঋজু-সংযুক্তা।

ওদের ছেলেমেয়েরাও সব কাছাকাছি বয়সের।

অসীম-রুমার বড়ো ছেলে লাপ্পার চেয়ে দু'বছরের বড়ো, ছোটছেলে একবছরের ছোট।

ঋজু-সংযুক্তার দুই যমজ সন্তান, লাপ্পার বয়সী – এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওদের ছ'জনের দলটা খুব সহজে মিশে গিয়েছিলো একে অপরের সঙ্গে, তাই মা-বাবাদের মেলামেশাটাও গিয়েছিলো বেড়ে।

ডিনার করে সবাই ফ্যামিলি রুমে এসে বসলো, বাচ্চারা গেলো বেসমেন্টের প্লে-রুমে। রীতা প্রস্তাব দিলো অন্ত্যাক্ষরী খেলা হোক – বাংলা গানের। ঋজু শুরু করলো বেসুরো গলায় "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় আয় ....."।

সংযুক্তা টিপ্পনী কাটলো – "এই ডাক শুনে কেউ আসবে না, সব পালাবে ..... গান না গোঙানি!"

সবার হো হো হাসির মধ্যে ঋজু চোখ পাকালো – "চুপ ! শুরু করো নয়তো আউট ..... অ১ অ২ অ৩।"

সংযুক্তা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলো – "অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে। ইঁদুরছানা ভয়ে মরে, ঈগলপাখী পাছে ধরে। ...... র১ র২ র৩ র৪।" রুমা শুরু করলো – "রুমঝুমঝুমঝুম রুমঝুমঝুমঝুম, রুমঝুমঝুমঝুম রুমঝুমঝুমঝুম ..... ম১ ম২ !" অসীম গেয়ে উঠলো – "মনের দুয়ার খুলে কে তুমি এলে বলো না ..... ন। শুচি, তোমার টার্ন।"

একসেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থেকে শুচি ধরলো – "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছো নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছো গোপনে, হে। বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশি পাগলের মতো। স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছো শয়নে-স্বপনে হে, রয়েছো নয়নে নয়নে।"

শুচি থামতেই সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো – "থামলে কেন ? করে যাও, করে যাও।" অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসে এতো ভালো গান শুনবে, কেউ ভাবতেই পারেনি। খেলা মাথায় উঠলো, সবাই ধরে বসলো যে শুচিকে গান শোনাতে হবে। "না না" করেও পার পেলো না শুচি।

পরপর পাঁচখানা গান শোনালো, সবার শেষে ওর প্রিয় সেই গানটা – "পরবাসী, চলে এসো ঘরে অনুকূল সমীরণ ভ'রে ....।"

এরপর শুচির গানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হলো না। পুজো এবং অন্যান্য সব বাঙালী অনুষ্ঠানে বাঁধা হয়ে গেলো শুচির গান।

একেকসময় শুচির যেন বিশ্বাস হতো না যে এটা বাস্তব, মনে হতো স্বপ্ন দেখছে না তো ?

যা যা চেয়েছিলো জীবনে – চাকরি করার স্বাধীনতা, সমান অধিকারের সম্মান নিয়ে বাঁচা, নিজের উপার্জনের টাকায় কিছু শখ মেটানো, মুক্ত মনে গান দিয়ে সুন্দরের আরাধনা – সেই সবকিছু যে সত্যিই পেতে পারে এই জীবনে, সেই বিশ্বাসটাই তো ও হারিয়ে ফেলেছিলো টালিগঞ্জের বাড়ীতে বসে। সেই বিশ্বাস হারানো থেকে এলো তিক্ততা আর জ্বালা, তারপর ডিপ্রেশন। .... কত পথ পেরিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছনো, ভাবতে গেলেও বুকের পাঁজর শুদ্ধু কেঁপে ওঠে যন্ত্রণায়।

তাই সেইসব নিয়ে আর ভাবতে চায় না শুচি। কিন্তু না চাইলেও সেই দিনগুলো মাঝে মাঝেই সামনে এসে দাঁড়ায় – জাগরণে না হোক, স্বপ্নে। আর ভিজিয়ে দিয়ে যায় শুচিকে।

সুশোভন এত সব ভাবার পক্ষপাতী নয়। ও মনে করে জীবনের গতি রোধ করার সাধ্য যখন আমাদের নেই, তখন জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। অকারণ চিন্তায় মনের শান্তি নষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। শুচি আর লাপ্পাকে নিয়ে বানানো এই সংসারই সুশোভনের সব, এর বাইরে আর কিছু নিয়েই ভাবেনা ও। ব্যস্ত থাকে নিজের কাজ নিয়ে।

প্রথম লন্ড্রিটা বিক্রি করে, সুশোভন পাশের শহরে আরেকটা লন্ড্রি কিনছে – একটু কাছে হবে, যাতায়াতে কম সময় যাবে। সুশোভন এখন লাপ্পার সঙ্গে অনেকটা সময় দিতে চায়। লাপ্পার পড়াশোনা, গান, চিন্তাভাবনা সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায় ও।

আগামী শনিবার সেই নতুন লন্ড্রির উদ্বোধন। প্রতিবারের মতো এবারেও, শুচির হাত দিয়ে ফিতে কেটে হবে উদ্বোধন। বিকেল চারটেতে সময় ঠিক হয়েছে।

মুস্কিল হচ্ছে যে সেইদিনই আবার রুমার ছোটছেলের জন্মদিন। দুপুর দুটোতে শুরু হবে বাড়ীর পেছনের লনে বাচ্চাদের water games দিয়ে, শেষ হবে রাত্রে বাড়ীতে বাচ্চা এবং তাদের মা-বাবাদের সম্মিলিত ডিনার পার্টি দিয়ে। অসীম-রুমা অবশ্য মা-বাবাদেরও বলেছে দুপুর দু'টোয় চলে আসতে – বাচ্চারা যতক্ষণ above-ground wading pool-এ লাফালাফি করবে, বাবারা ততক্ষণ beer নিয়ে backyard-এ chill করবে আর মা-রা রাত্রির পার্টির যোগাড় করতে করতে আড্ডা দেবে। Summer-ই তো time outdoor enjoy করার!

শুচি রুমাকে বলেছে যে ওরা দু'টোর সময় লাপ্পাকে নামিয়ে, চলে যাবে লন্ড্রির উদ্বোধনে। সাড়ে পাঁচটা-ছটার মধ্যে ফিরে এসে যোগ দেবে ডিনার এবং আড্ডায়। সেইমতো লাপ্পাকে নিয়ে সওয়া একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লো শুচি-সুশোভন।

লাপ্পা খুব excited, মা-বাবাকে তাড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী করালো – পার্টির কিচ্ছুটি ও miss করতে চায় না।

এখানকার নিয়ম অনুযায়ী, birthday gift ছাড়াও শুচি সঙ্গে নিয়েছে বড়দের ডিনারের জন্য বানানো একটা dish। রুমা বলেছে বাচ্চাদের জন্য থাকবে পিৎজা আর কেক, এছাড়া মা-বাবারা প্রায় কুড়িজন লোক হবে – ছ'টি বাঙালী couple, ওদের প্রতিবেশী তিনটি South Indian family আর রুমার ছেলের ক্লাসমেট আরেকটি মেয়ের মা-বাবা। শুচি সেইমতো চিলি-চিকেন বানিয়ে নিয়েছে।

রুমাদের বাড়ী পৌঁছে দেখলো পার্টি জমে উঠছে। এখনো সবাই আসেনি। বাইরে pool set up করা হচ্ছে। ঘর সাজানো হচ্ছে বেলুন দিয়ে। শুচিও হাত লাগালো। সুশোভন একটা নববৎ নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলো ঋজু আর অসীমের সঙ্গে। ঘন্টাখানেক থেকে, বেরিয়ে পড়লো ওরা লন্ড্রির দিকে।

শুচি লাপ্পাকে বলে দিলো যে ওরা একটুক্ষণ বাদে ঘুরে আসছে।

রুমা হেসে বললো – "তোমার ছেলে যা শান্ত, ওকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আর fence দেওয়া আছে লনের চারদিকে, অসীমও নজর রাখছে। একটুক্ষণ জলে দাপাদাপি করবে বাচ্চাগুলো, তারপরই ঘরে চলে আসবে। স্যান্ডউইচ বানিয়ে আনছে রীতা – খেয়ে নিয়ে তারপর সব ভেতরেই থাকবে।"

ছুটির দিন, রাস্তায় ভিড় কম। সাড়ে তিনটে নাগাদ নতুন লন্ড্রিতে পৌঁছে গেলো শুচি-সুশোভন। কেটি এখনো এসে পৌঁছয়নি। কেটি সুশোভনের প্রথম লন্ড্রির কর্মচারী। লন্ড্রি বিক্রি করার সময়ে ওকে একটু বেশী পয়সা দিয়ে নিয়ে এসেছে সুশোভন। ও এখন দ্বিতীয় দোকানটার কাজ করে, ক্যাশও দেখে – প্রায় সবটাই ম্যানেজ করে সুশোভন না থাকলে। ও-ই এখন থেকে বেশী দেখবে ঐ দোকানটা, কারণ সুশোভনকে সময় দিতে হবে নতুন দোকানের পেছনে।

অন্য দোকানটা বন্ধ করে, সব কর্মচারীদের নিয়ে কেটির এখানে আসার কথা। ওরাই তুলে আনবে বেলুন, ড্রিঙ্কস আর কুকি। কিছু বেশী করেই আনতে বলেছে সুশোভন। একমাস আগে থেকেই চারপাশে ফ্লায়ার ছড়ানো হয়েছে। আজকে যেসব কাস্টমাররা আসবে তারা স্পেশাল দাম পাবে – এছাড়া থাকবে কুকি আর ড্রিঙ্কস্।

চারটে বাজার দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলো সবাই। বেলুন আর রঙীন ফিতেতে সাজানো দরজা খোলা হলো – শুচি কাটলো ফিতে। সুশোভনের ক্যামেরা ধরে রাখলো মুহূর্তটা – ভিডিও আর স্থিরছবিতে। ভেতরে গিয়ে কুকি আর ড্রিঙ্কস্ সাজিয়ে রাখা হলো টেবিলে। কেটি মার্থাকে নিয়ে পেছনে গেলো মেশিনগুলো চেক করতে, রন্ডা পরিস্কার ফ্লোরটা আরও পরিস্কার করতে লেগে গেলো। সুশোভন ক্যাশে এসে বসলো। শুচি চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন কাস্টমার এলো, দশমিনিটের মধ্যে আরও একজন। সবার হাতেই ফ্লায়ার। অর্থাৎ মার্কেটিং কাজ করেছে – খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই "ডিসকাউন্ট" অফার করা স্পেশাল ফ্লায়ার পাঠানো হয়েছিলো পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে চারজন কাস্টমার এলো, সবাই এশিয়ান। এই পাড়াটায় অনেক এশিয়ান ইমিগ্র্যান্ট আছে। সুশোভন ভেবেছিলো পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু হলো না। আরও দু'জন এসে গেলো।

সব শেষ করে বেরোতে বেরোতে ছটা বেজে গেলো। মোট আটজন কাস্টমার এলো এই দু'ঘন্টায় – মন্দ নয়!

লন্ড্রি বন্ধ করে গাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুশোভন বললো – "আশা করি দাঁড়িয়ে যাবে এটাও।" শুচি হেসে বললো – "নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবে ..... তুমি যা মিঠি মিঠি করে কথা বলো কাস্টমারদের সঙ্গে!"

সুশোভনও হাসলো – "শুধু কাস্টমারদের সঙ্গে? তোমার সঙ্গে বলি না মিঠি কথা?" হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠলো দু'জনে।

হাইওয়েতে জ্যাম। কোনো লেনেই গাড়ী চলছে না। এইসময় এইরকম জ্যাম হওয়ার তো কথা নয় ..... ব্যাপার কি? একটু এগিয়েই দেখা গেলো, এ্যাক্সিডেন্ট। একটা গাড়ী পেছন থেকে এসে ধাক্কা দিয়েছে অন্যটাকে। পেছনের গাড়ীটার সামনেটা দুমড়ে মুচড়ে একাক্কার হয়ে গেছে, উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে চুরচুর। সামনের গাড়ীটাও ভেঙেছে, তবে বড়ো SUV বলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পেছনের গাড়ীর লোকজন বেশ ভালোই injured বলে মনে হচ্ছে। এ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ীতে ভরা জায়গাটা, দুটো লেনই বন্ধ। তৃতীয় লেনটা দিয়ে শম্বুকগতিতে গাড়ী এগোচ্ছে।

শুচি চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো – "ইস্, এই ভরা দিনের আলোয় ..... সুন্দর ওয়েদারে ..... বৃষ্টি নেই ..... স্নো নেই ..... এরা কি চোখেও দেখেনা? কি করে ধাক্কা মারে এ'ভাবে?" সুশোভন বললো – "মনে হচ্ছে last minute-এ পাশ কাটাতে গেছিলো, অন্য লেনে চলে গেছে খানিকটা। কথা বলতে বলতে চালাচ্ছিলো বোধহয়। ..... এইজন্যই তোমাকে বলি সবসময় সীটবেল্ট লাগাতে। তুমি তো মনে করো পেছনে বসলে সীটবেল্ট লাগানোর দরকারই নেই। এরকম ধাক্কায় সামনে-পেছনে সবদিক থেকে injured হতে পারে passengers-রা।"

শুচি বললো – "আশা করি কেউ মারা যায়নি ...... এতো স্পীডে গাড়ী চালায় এখানে যে একটু ধাক্কা লাগলেও মারাত্মক। দেশে তো সবাই লেন ভেঙে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে, কিন্তু এতো fatal accident হয়না ......স্পীড কম!" সুশোভন বললো – "স্পীড এখানে বেশী ঠিকই, তবে accident is accident – কারণ খুঁজে লাভ নেই।"

বাকী রাস্তাটা চুপচাপ কাটালো দু'জনে, মুডটা অফ হয়ে গেছে। রুমাদের সাবডিভিশনে ঢুকে সীটবেল্ট খুললো শুচি। প্রথম রাস্তাটা ঘুরলেই ওদের বাড়ী।

বাড়ীর সামনে এসে আবার চমক। রাস্তায় দু'টো পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় জ্বলছে লাল-নীল আলো। কাছে এসে দেখলো রুমাদের বাড়ীরই সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়ানো গাড়ীদু'টো। ওদের বাড়ীর সামনের দরজাটা হাট করে খোলা। "এখানে আবার কি হলো?" বলতে বলতে গাড়ীটা কোনোরকমে পার্ক করে সুশোভন দ্রুতপায়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। পেছনে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে শুচি।

ওরা দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা family room-এ চলে এলো। সবাই সেখানেই রয়েছে, বাচ্চারা ছাড়া – ওদের বোধহয় কেউ সরিয়ে নিয়ে গেছে।

অতিথিরা এবং পুলিশ অফিসার দু'জন কথা বন্ধ করে তাকালো শুচি-সুশোভনের দিকে।

একজন পুলিশ অফিসার অসীমকে জিজ্ঞেস করলো – "Are they the parents ?"

অসীম মাথা নীচু করে বললো – "Yes." সুশোভন বললো – "What happened ?"

পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসে বললো – "You please come with me, Sir. You too, Ma'm."

শুচির গলা কেঁপে গেলো – "আর লাপ্পা ? লাপ্পা কোথায় ? .... Where is he ?"

রুমা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো – "লক্ষ্মী জানতো না এ্যালার্জির কথা ..... আমিও জানতাম না যে ওর বানানো Dip-এ crushed chickpeas আছে ..... বাচ্চারা তো স্যান্ডউইচ খেয়ে ওপরেই খেলছিলো ..... কখন যে হঠাৎ এসে আমাদের snacks আর dip খেতে আরম্ভ করেছে কিকরে জানবো ..... আমি কিচেনে ..... ওরা family-room-এ গিয়ে ..... আমি ..... so sorry শুচি ..... লন্ড্রিতে ফোন করলো অসীম কিন্তু no reply ....." রীতা এসে রুমাকে জড়িয়ে ধরলো, সংযুক্তা শুচিকে।

শুচির কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না – কিচ্ছু না।

মনে হচ্ছে ও যেন জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কানে জল ঢুকছে আর কথাগুলো সব অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার সুশোভনকে কি সব বলে যাচ্ছে - "Yes .... 911 call made within minutes of your son chocking .... paramedics came within 7 minutes ..... they tried ..... the ambulance has taken him to the nearest hospital ..... you and your wife have to come to the hospital with us. Let's do the formalities there."

সুশোভন একবার বোবা চোখে শুচির দিকে তাকালো – সেখানেও ভাষা নেই। অসীম, ঋজু আর সংযুক্তা ওদের সঙ্গে হাসপাতালে এলো। কাগজপত্র, ডেথ সার্টিফিকেট সব নিয়ে বেরোতে বেরোতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেলো। হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো লাপ্পার। নিষ্প্রাণ অথচ এখনো তাজা মুখটাকে একবার ছুঁলো সুশোভন, শুচি শুধু দূর থেকে তাকিয়ে দেখলো। বডি মর্গে রাখা রইলো, ক্রিমেশনের ব্যবস্থা হতে ক'দিন সময় লাগবে। অসীম ফিরে গেলো।

ঋজু ওদের গাড়ী চালিয়ে বাড়ী নিয়ে এলো, ও আর সংযুক্তা আজ রাতে থাকবে শুচিদের সঙ্গে। ওদের বাচ্চারা অসীমদের বাড়ী থাকবে, কাল তুলে নেবে ওদের।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরোনো দিনের কথা

পর্ব ৫

সাত দশক পূর্বের পুরোনো কলকাতার কিছু স্মৃতিচারণ

আমার পিতার চাকুরিসূত্রে আমরা তখন বহুদিনের ব্যাঙ্গালোর প্রবাসী। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগসুত্র তো ছিলই, মা ও বাবার অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাস তো এই শহরেই, এটি তো আমাদের জন্মভূমি। যদিও তখন ব্যাঙ্গালোর সুদূর বিদেশ বলেই গণ্য হতো .... ট্রেণে প্রায় ৬২ ঘন্টার ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মাদ্রাজে সারা দিন অপেক্ষা .... তবুও সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম বা পুজো-আচ্চা উপলক্ষ্যে বছরে একবার যাতায়াত প্রায় অবধারিত ছিল।

আমার উপনয়ন উপলক্ষ্যে কলকাতা যাওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়লো। ১৯৪৯ সাল, আমার বয়স প্রায় ১৩। কলকাতায় যাচ্ছি, সেখানে সবার সঙ্গে আবার কত দিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-গল্প-গান-মজা, আমার আনন্দ-উত্তেজনার শেষ নেই। মা তো বাপের বাড়ী যাচ্ছেন বলে আনন্দে আত্মহারা ! লম্বা ট্রেন ভ্রমণের কথা ভেবে একটু দমে গেলেও, অফুরন্ত উৎসাহ। এই সময়ে একটি অচিন্ত্যনীয় সুযোগের উদয় হলো। একটু বিশদভাবে খুলে বলি।

ব্যাঙ্গালোরে তখন বাঙ্গালীরা কুল্লে শ' দু-তিন হবেন কি না সন্দেহ। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে সরকারী ও বেসরকারী উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত। স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের – যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম তখনই দেশে ও বিদেশে বিস্তার পেয়েছে – অধ্যক্ষ। সেখানে তিন চার জন বিখ্যাত বাঙ্গালী অধ্যাপক তাঁর সহায়ক হয়ে আছেন। মাইশোর স্টেটের একাউন্টটেন্ট-জেনারাল অর্থাৎ মুখ্য-মহাগাণনিক মিঃ ঘটক। তাঁর উত্তরসূরীও একজন বাঙ্গালী মিঃ পি কে সেন। ব্যাঙ্গালোরের প্রথম বেতার কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ নন্দী। আন্তর্জাতিক ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর (যেটি পরে ইন্ডিয়ান টোবাকো কম্পানী বা ITC নামে অভিহিত হয়) চিফ একাউন্টটেন্ট মিঃ সঞ্জয় বোস। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের এক অত্যুচ্চ পদের অধিকারী মিঃ রাণা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ সেন ও তাঁর দুই সহকারী ডঃ বোস ও ডঃ রায় সারা ভারতবর্ষে সরকারী দুগ্ধ প্রযোজনার সূচনা করেন, এই পরিকল্পনা তাঁদেরই উদ্ভাবনা, যার ফলে হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের সৃষ্টি। ডঃ রায়ই কলকাতায় এর প্রথম অধিকর্তা হয়ে আসেন। এবং মিঃ মোহিত সেনগুপ্ত ICS, এক অতি সুদক্ষ, বিজ্ঞ ও প্রবীন আমলা, যাঁকে নেহেরুজি স্বয়ং দিল্লি থেকে পাঠিয়েছেন হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফট নামক বিমান মেরামতের কারখানাটির সর্বময় কর্তা করে। উদ্দেশ্য, এই

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বা টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স

ছোট কারখানাটিকে আমূল সংস্কার করে একটি বৃহৎ বিমান নির্মাণ ও সারাইএর প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা। এটি তখন যুদ্ধের পর আমেরিকার পরিত্যক্ত প্রপেলর ইঞ্জিনযুক্ত ডেকোটা বিমানগুলির ভারতে মেরামতির প্রধান কারখানা ছিল। এই হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফটিই পরে বিকাশিত হয়ে অধুনা হিন্দুস্তান এরোনটিকে পরিণত হয়ে জেট ট্রেণার বিমান নির্মাণ করছে। অতএব ব্যাঙ্গালোরের তখনকার ক্ষুদ্র বাঙ্গালী সম্প্রদায় উজ্জ্বল সব নক্ষত্র শোভিত ! সোনায় সোহাগার মতো বাসভানগুডির শ্রীসারদামাতার পূণ্যপাদস্পর্শধন্য রামকৃষ্ণ আশ্রমটি সেই মহাজ্ঞানী প্রবীণ শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ও তাঁর নিষ্ঠাবান সহায়ক সন্ন্যাসীদের পরিচালনায় সারা ব্যাঙ্গালোরবাসীরই এক অতি প্রিয় ধর্মীয় স্থান। (তখন মাননীয়দের মিষ্টার বলেই সম্বোধন করা হতো, “শ্রী” উপাধিটি অনেক পরে আসে)

ব্যাঙ্গেলোরের পুরোনো এরোড্রোম

সেযুগের সুপরিচিত বিমান – ড্যাকোটা ডি সি ৩

ডাকোটা টেকঅফের পথে

মিঃ মোহিত সেনগুপ্তই বাবাকে পরামর্শ দিলেন। তিনি অবহিত ছিলেন আমরা কলকাতা যাওয়ার তোড়জোড় করছি, তিনি জানালেন যে একটি ডেকোটা প্লেন এখানে মেরামতির পর কলকাতায় খালি ফিরে যাচ্ছে, আমরা ঐটি বাহন করে স্বচ্ছন্দে কলকাতায় উড়ে যেতে পারি। অবশ্যই বিনা ভাড়ায়, কেননা তখন তো বাণিজ্যিক বিমানযাত্রী পরিষেবা ছিল না, উচ্চপদের কর্তাদের পরিচিতরাই সুযোগ পেলে এইরূপ বেসরকারী ভাবে মাঝে মাঝে বিমান ভ্রমণের সুযোগ নিতেন। অবশ্য কোন স্থান বা কালের নির্দিষ্টতা ছিল না, বিমানগুলি সৈন্যবাহিনীর মালপত্র পরিবহনেই নিযুক্ত ছিল। আর মোহিতবাবু তো ওখানকার সর্বময় কর্তা, তাঁর বন্ধুদের তো অগ্রাধিকার !

এই অপূর্ব সুযোগ ছাড়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না ! অতএব এক প্রত্যুষে, সিমেন্টের মেঝে ও এসবেসটরের ছাতসম্বলিত ব্যাঙ্গালোরের ব্যারাকসদৃশ এরোড্রমের হল ত্যাগ করে আমরা বিমানটিতে আরোহণ করলাম। সেটি ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ সালের একটি ঝকঝকে দিন। ২১টি আসনবিশিষ্ট ছোট বিমানটিতে আমরা তিনজনই যাত্রী। পাইলটটি অস্ট্রেলিয়ান হাস্যমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

জীবনে এই প্রথম বিমান যাত্রা। দুরুদুরু বক্ষে, উত্তেজনামিশ্রিত আনন্দে আমরা বিমানটি চালু হবার প্রতীক্ষায় রইলাম। অবশেষে সেই মহামূহুর্ত এলো, বিকট কর্ণবিদারি আওয়াজে বিমানটি উড্ডীন হলো। সেটি তো আর আধুনিক বিমানের মতো উচ্চ প্রযুক্তিতে নির্মিত নয়, কি ঘোর তার নিনাদ, কি তীব্র তার কম্পন ! তবুও আমরা যে আকাশপথে উড্ডীয়মান এই আনন্দেই আমরা আত্মহারা ! কিছুক্ষণ পরে পাইলটটি সস্নেহে আমাকে ককপিটে আহবান করলেন, আমার যেন আনন্দের সম্ভার ষোলকলা পূর্ণ হলো। তিনি মিটারগুলি দেখে বোঝালেন আমরা ভূমি থেকে ৯০০০ ফিট উচ্চে ঘন্টায় ২৫০ মাইল বেগে যাচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যাব। কলকাতা যেতে লাগবে সাড়ে ছ' ঘন্টা, আকাশ পরিষ্কার, আবহাওয়া চমৎকার। আমার এই ১৩ বছরের দিনে এত এডভেঞ্চারাস দিন আর কখনো আসে নি !

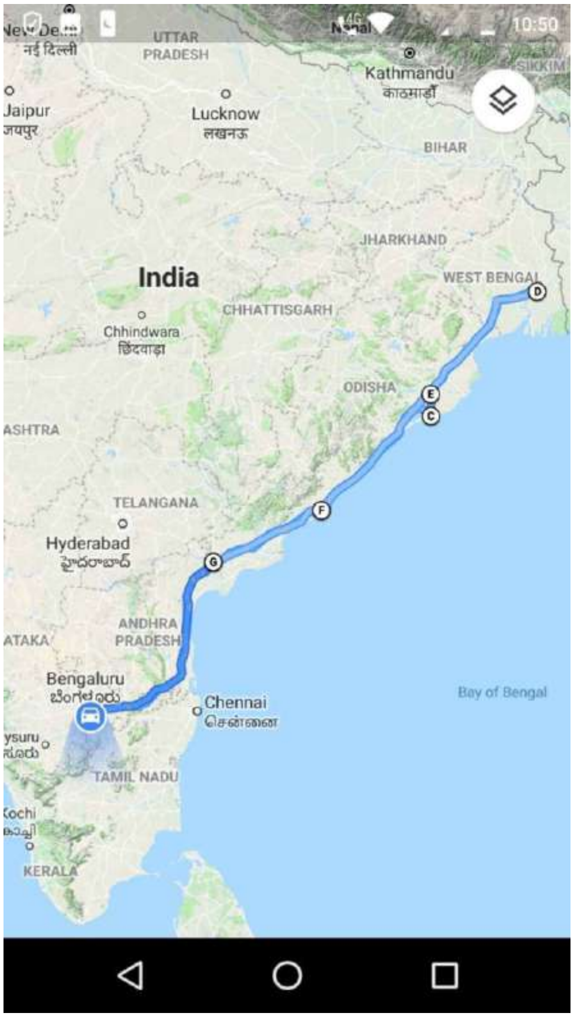

ব্যাঙ্গালোর-কলকাতা হাওয়াই রুট

ঠিক সময়েই বেলা সাড়ে বারো নাগাদ আমরা দমদম এরোড্রমে অবতরণ করলাম। তখন এয়ারপোর্ট কথাটি চালু হয় নি, বিমানপোত এরোড্রম নামেই সম্বোধিত হত। সেখানেও একটি অনাড়ম্বর হলঘর, অল্প কয়েকজন কর্মচারী ঘোরাফেরা করছেন, মুষ্টিমেয় দু-তিনটি ছোট বিমান ওঠানামা করছে, কর্মচাঞ্চল্যর কোন চিহ্ন নেই। ৬২ ঘন্টা ট্রেন ভ্রমণের পথটি সাড়ে ছ' ঘন্টায় অতিক্রম করে আমরা যারপরনাই উল্লসিত ও কলকাতায় এসে পৌঁছেছি বলে ততোধিক উৎফুল্ল ! কিন্তু ভবানীপুরে দাদামশায়ের বাড়ী যাওয়ার বাহন কোথায় ? এ তো তেপান্তরের মাঠ, কর্মচারীরা সব সাইকেলে বা নিজের বাহনে এসেছেন, আমরা যাব কি ভাবে ? অবশেষে একজন সহৃদয় কর্মী সাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে যশোর রোড থেকে একটি ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিলেন, সেটিই আমাদের পরিত্রাতা হল।

পুরোণো কালের দমদম বিমানবন্দর

তখন শহর থেকে দমদম যাবার একমাত্র বড় রাস্তা ছিল যশোর রোড। শ্যামবাজার হয়ে প্রায় সারা কলকাতা বেষ্টন করে আমরা ভবানীপুর পৌঁছোলাম প্রায় দেড় ঘন্টায়। তারপরেই সস্নেহ ও সাদর অভ্যর্থনা, কন্যা সপরিবারে সুদূর বিদেশ থেকে পিতৃগৃহে এসেছেন বহুদিন পরে, অতএব আদর-উচ্ছ্বাস অপরিমিত হবে তার আর আশ্চর্য কি ! আর বিমান ভ্রমণ করে আমরা তখন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সবাই সেই অভিজ্ঞতা শোনার জন্য আগ্রহী !

কিছুদিন বাদেই আমার উপনয়নের দিন। তারপর যথারীতি পূজা, হোম, মস্তকমুন্ডন ইত্যাদির পর দন্ডীঘরে নির্বাসন ও ভিক্ষাগ্রহণ। ভবান বা ভবতী দীক্ষাং দেহি – ভিক্ষার ঝুলি অজস্র বার পূর্ণ হলো ও ভিক্ষাদ্রব্যগুলি পর্বতপ্রমাণ হয়ে জমা করা

হল। এখন তিন দিন ঘরবন্দী ও বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া কারু মুখদর্শন নিষেধ। তবে আমার কোন অসুবিধাই হলো না, ভিক্ষায় লভ্য সব আকর্ষণীয় উপহারগুলি আমাকে যথেষ্ট দখল করে রেখেছিল। কয়েকটির কথা স্মরণ আছে, বড় পিসীমার দেওয়া সুইৎসারল্যান্ডের ফেবার-লিউবা কম্পানীর ১৪-ক্যারট সোনার হাতঘড়ি – আমার জীবনের প্রথম ঘড়ি, প্রাণাধিক যত্নে বহুদিন ব্যবহার করেছিলাম। আর একটি লুকাসের সাইকেলের ডায়নামো লাইট, এটি আমার এক পিসতুতো বোনের দান, আমারই চাহিদায়! পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম ও অজস্র আংটি। তখনকার দিনে ৮০ টাকা ভরির (১ ভরি = ১১.৬৪ গ্রাম) সোনার দরে দশ-বারো টাকায় সুন্দর আংটি পাওয়া যেত। তবে আমার সর্বাধিক মনোহরণ করেছিলো উপহার পাওয়া ২৫-৩০ খানি বাংলা ছোটদের গল্পের বই ও নগদ রৌপ্যমুদ্রা প্রায় ৫০টি। মনে পড়ছে প্রথম যে বইটি ঐ ঘরে বসে পড়ি সেটি হচ্ছে বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আম আঁটির ভেঁপু, পথের পাঁচালীর ছোটদের সংস্করণ। কয়েকটি বিখ্যাত ইংরাজি উপন্যাসের ছোটদের অনুবাদ-সাহিত্য, যেমন ট্রেজার আয়ল্যান্ড, কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স অপূর্ব লেগেছিলো। তিনদিন সময় ভালোই কেটেছিলো, তবে নিরামিষ রান্না অরুচিকর হয়ে গিয়েছিলো। ঐ টাকার পরে সদব্যবহার করি একটি কোডাক বক্স ক্যামেরা কিনে। যে গীতাটি আমার পিতা আমাকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন এই ৭২ বছর পরো সেটি আমার নিত্যসঙ্গী।

এর কিছুদিন পরেই আমরা ব্যাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তন করি ভারাক্রান্ত মনে, এবার অবশ্যই ট্রেনে। এই আনন্দমেলার আসর থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশে ফেরা, আবার সেই স্কুল-পরীক্ষা ও আত্মীয়স্বজনবিহীন জীবন চিন্তা করে মন অতি বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

(আজ এখানেই দাঁড়ি টানি। আপনাদের মনঃপুত হলে ক্রমান্বয়ে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ অর্থাৎ ১৯৫০ দশকের আমার কৈশোর ও যৌবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কলকাতার স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে আপনাদের উপহার দেবার ইচ্ছা আছে।)

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

MCTE-MHOW

পর্ব ১০

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ দশম পর্ব।

এখন লিখতে বসেছি Military College of Telecommunication and Engineering (MCTE) বা মৌ-এর কথা। এই মৌ নামটার একটা ব্যাখ্যা আছে। এই জায়গাটার নাম ইংরেজরা রেখেছিল Military Headquarter of War বা MHOW। ইংরেজরা এই জায়গাটা পছন্দ করেছিল এর আবহাওয়ার জন্য। এর ওয়েদার এত ভালো যে এপ্রিল-মে মাসেও খুব একটা গরম পড়ে না। শেষ রাতে একটা হালকা চাদর গায়ে দিলে ভালো লাগে। আর ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে একটা পাতলা কম্বল গায়ে দিলে আর কিছু লাগবে না। সেই জন্য তারা নাকি এই জায়গাটা পছন্দ করেছিল। তাদের তৈরি করা দোতলা ব্যারাকের সিঁড়িটা কাঠের তৈরি। কি কাঠ দিয়ে তৈরি করেছিল কে জানে! ওই সিঁড়ি দিয়ে কত বছর ওঠানামা করছে মিলিটারির লোকেরা, আমরাও করেছি। কিন্তু সিঁড়ির কিছু ক্ষতি হয়নি। জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল আর ওই ইউনিটের কাজ তো খুব ভালো ব্যাপার ছিল, সব মিলিয়ে বেশ আনন্দে কেটেছিল ওখানে।

ওখানে অফিসারদের SODE বা Signal Officer Degree Engineering নামে একটা কোর্স হত। এই কোর্সটাকে সিভিল-এর ই.ঊ.-র সমান মানা হতো। আর হত F of S বা Foreman of Signal-এর কোর্স, তার সঙ্গে RM1 বা Radio Machanic Class I-এর কোর্স, TM1 বা Tele Mechanic Class 1-এর কোর্স এবং LM1 বা Line Mechanic Class I-এর কোর্স। মিলিটারীর সবথেকে বড় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ছিল। ওখানে যত থিয়োরি ক্লাস হত সব CGO বা সিভিলিয়ান গেজেটেড অফিসাররা নিত কিংবা মিলিটারি অফিসার যারা SODE পাস করে গেছে তারা নিত। আমাদের কাজ ছিল ওয়ারলেস সেট-এর প্রাকটিকাল ক্লাস নেওয়া। কিভাবে বড় বড় ট্রান্সমিটার (Tx), রিসিভার (Rx) টিউন করতে হয়, কিভাবে একটা সেট অন্য লিঙ্কের সঙ্গে যোগ দেওয়ানো হবে, কিভাবে অন্য সেটের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আরেকটা সেটকে টিউন করতে হবে বা নেটিং করতে হবে এইসব। ওখানে যাওয়ার পর আমাকে ট্রান্সমিটার হল-এর দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমার উপরে আরো দু-তিন জন সিনিয়র মেকানিক ছিল। আমরা ফ্যাকাল্টি অফ কমিউনিকেশন উইং-এর আন্ডারে পোস্টিং ছিলাম। ওই Tx-হলে বড় বড় ট্রান্সমিটার, টেলিপ্রিন্টার দায়িত্ব ছাড়াও আর একটা দায়িত্ব ছিল। এ্রী-হলে একটা বড় লাইব্রেরী ছিল। সব বই Tx, Rx বা Tp (Teleprinter)-র উপর। লাইব্রেরীর সেই সব বই কেউ পড়তে চাইলে তার নামে ইস্যু করতে হত। কিন্তু ওখানে বসেই পড়তে হবে, ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্যারাকে আমাদের থাকার জায়গা দোতলায়। সেই কাঠের সিঁড়িতে বড় বড় বুটের ঠক ঠক আওয়াজ, সকলে ওঠানামা করছে। যদিও Tx-এ যাওয়ার সময় আমাদের বুট পরা নিষেধ ছিল। পিটি শু পরে যেতে হত।

যে ব্যারাকে থাকতাম তার ঠিক নিচে পিছনের দিকে একটা সুন্দর ফুটবল মাঠ ছিল। বিকেলে খেলাও হত সেখানে। Tx-এ সকালে পিটি প্যারেড বাদ দিয়ে প্রায় সব সময় থাকতে হত। সিনিয়রদের কাছ থেকে নতুন নানারকম কাজ শিখতাম। ছুটির দিনে Tx বন্ধ থাকত। আমাদেরও ছুটি। এখানে কোন কড়াকড়ি ছিল না। সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়া করে

প্রায় প্রতিদিনই বাইরে বেড়াতে যেতাম। সুনীল দাস বলে তমলুকের একজন ছিল, তার সাথে আলাপ হল। দাস বাদ দিয়ে আরো অনেক বাঙালি ছিল, ধীরে ধীরে সকলের সাথে আলাপ হল। স্টাফ বাদ দিয়ে যারা ট্রেনি, সেখানেও অনেক বাঙালি আছে, তাদের সঙ্গেও ধীরে ধীরে আলাপ হল। মাঝে মাঝে সময় হলে ফুটবল মাঠে গিয়ে খেলা দেখতাম। ভালো লাগত। যেখানে ফুটবল মাঠ আছে, খেলার সুযোগ আছে, সেখানে বেশিদিন ওখান থেকে দূরে থাকা আমার ক্ষেত্রে একটু মুশকিল হয়। Tx-হলের ফোরম্যানকে বলে প্রতিদিনই বৈকালে ফুটবল খেলতে যেতাম। মাঠে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম একজন নাইজেরিয়ান ছাত্র মাঠে আসে, তার পা থেকে বল বার করা যায় না। আমি নিজেকে বড় ফুটবলার মনে করতাম, মনে করতাম, দেখতে হবে কত বড় প্লেয়ার সে। একদিন সেই চেষ্টায় লেগে পড়লাম। সেই নাইজেরিয়ান এর বিপরীত দিকে খেলছি। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা, কালো রঙ আর হাসলে সাদা দাঁতটা বেরিয়ে পড়ে। বেশ লাগে দেখতে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, আমি ওর ক্ষমতা মাপার চেষ্টা করছি। ইচ্ছে করে পায়ের নিচে বলটা চেপে রাখত, আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর কাছ থেকে বল বার করতে পারিনি। পায়ে বলটা চেপে রেখে দাঁত বের করে এমন ভাব দেখাত যে, এসো ক্ষমতা থাকে তো বল কেড়ে নাও আমার কাছ থেকে। যদিও চেষ্টা করেও কোনদিনই পারিনি। ওখানে একটা ফ্যাকাল্টির সঙ্গে আরেকটা ফ্যাকাল্টির ম্যাচ হত, আর পার্মানেন্ট স্টাফ আর ট্রেনিদের সাথে ম্যাচ হত। মউ-এর টিমের একটা ছবি সম্ভবত বাড়ির অ্যালবামে আছে। খেলা এবং ওখানকার যা কাজ, সব মিলিয়ে বেশ ভালোই কাটছিল ওখানে।

Tx-হলের আরেকটা ডিউটি ছিল Arial Erection-এর demo দিতে হত। চারজন থাকতাম একটা দলে। মোবাইল Tx-এর গাড়ি যার মধ্যে একটা একটা পুরো Tx-স্টেশন থাকত। ওই গাড়িতে মনিটর করার জন্য একটা Rx-I থাকত। এই মোবাইল ভ্যানটা কোন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে, কত তাড়াতাড়ি অন্য কোন স্টেশনের সঙ্গে কিংবা control station-এর সঙ্গে যোগ করা যায় তার demo হত। যদিও আগে থেকে ফ্রিকোয়েন্সি সব দেওয়া থাকত। ওই চারজনের আলাদা আলাদা ডিউটি ভাগ করা ছিল। কোন একটা জায়গায় পৌঁছে কত তাড়াতাড়ি এরিয়ালটাকে দাঁড় করিয়ে, সেট অন করে, অন্য লিংকের সঙ্গে নেট কানেকশন করা যায় – সেই সময়টা রেকর্ড করা হত। যেসব অফিসাররা ট্রেনিংয়ের জন্য আসত তাদের ওই demo দেওয়া হত। তাছাড়া F of S বা RMI-এর ছাত্রদের সামনেও demo দিতে হত। মৌ-তে থাকাকালীন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক ক্ষমতা মোটেই শক্তপোক্ত ছিল না। বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে সাহায্য চায়। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারত তখন বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশ-পাকিস্থান যুদ্ধ শুরু হয়। বাস্তবে ওটা ছিল ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। ভারত অনেক আগে থেকে বাঙ্গলাদেশের মাটিতে ঢুকে যায়। ভারতীয় সেনারা লুঙ্গি পরে বাঙ্গলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের জনগণকে বিভিন্ন ধরণের ট্রেনিং দিতে থাকে। Arms, ammunition এবং manpower সব রকম ভাবে সাহায্য করতে থাকে। যুদ্ধ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ভারত বাংলাদেশকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে থাকে। সেবার পাকিস্তান এত খারাপ ভাবে হারে, যে পৃথিবীর কোন দেশ বোধহয় যুদ্ধে এত খারাপ অবস্থায় পড়েনি। ভারতের স্থলবাহিনীর প্রধান তখন জেনারেল মানিক সাঃ। পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী ছিলেন বাহিনীর প্রধান। জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় বাহিনীর কাছে, টুপি, বেল্ট খুলে আত্মসমর্পন করেন। এত বড় লজ্জা আর হয় না। বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। ভারত প্রথম বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেয়। একে একে পৃথিবীর সব দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও ভারতীয় বাহিনী প্রায় ছ'মাস বাংলাদেশের মাটিতে ছিল, যাতে পাকিস্তান হঠাৎ করে কোন আক্রমণ না করে বসে। বাংলাদেশ বেসামাল না হয়ে যায়। ভারতীয় সৈন্যরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থাকার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ লোক সন্দেহ করতে থাকে ভারতকে। তারা মনে করেছিল, ভারত বোধহয় বাংলাদেশ ছাড়বে না। বাংলাদেশে পোস্টার পড়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি কুইট বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের লজ্জা। তারা ভারতকে বিশ্বাস করতে পারল না। পরে অবশ্য কাগজে লেখে, যারা এই রকম পোস্টার দিয়েছে তারা বাংলাদেশের শুভকামনা করে না। তারা বাংলাদেশের শত্রু। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মৌ-তে MCTE-র সব রকম ট্রেনিং চালু ছিল। আমাদের ১২ ঘন্টার নোটিশ দিয়ে রেখেছিল। যে কোনো সময় বর্ডারে পাঠাতে হতে পারে। যেহেতু

MCTE-র মোট এত বড় training institute-এর training staff ছিলাম আমরা তাই আমাদের নোটিশ দিয়ে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের মৌ ছাড়তে হয়নি। তবে সব সময় একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে দিন কাটত। এই বুঝি আমাদের পাঠাবে। তবে একটুও ভয় লাগত না। কারণ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। আমরা ওখানেই রয়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য আমাদের এখানে কিছু ছাত্র আসতে থাকল। বাংলাদেশের ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নানা রকম ট্রেনিংয়ের জন্য আসতে লাগল। EST-22-এ কালসী বলে একটা জায়গায় ওদের বড় ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। জানিনা এখনো আছে কি না। মৌ-তে বাঙ্গালীদের একটা বড় গ্রুপ ছিল। একসাথে বেড়াতে যেতাম। আউট পাস নিয়ে ইন্দোর, উজ্জয়নী ঘুরে আসতাম। খুব একটা দূরে ছিল না।

হঠাৎ একদিন বড়দার একটা চিঠি পেলাম। বড়দার অফিসে পরে যাওয়ার কোটটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি যেন ভালো দেখে একটা কোটের কাপড় কিনে নিয়ে যাই। কলকাতায় কি কোটের কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না ! এখন আমার যা মাহিনা তাতে ভালো দেখে কোটের কাপড় কিনতে গেলে বাবাকে টাকা পাঠানোর অসুবিধে হবে। অথচ বাবাকে টাকা পাঠানো কতটা জরুরী আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। অন্যদিকে বড়দা চেয়েছে সেখানে না করতে মন সায় দিচ্ছে না। অন্য ছেলের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করলাম। বাবাকে একটু কম পাঠালাম। বাবা কোনদিন টাকা-পয়সার জন্য বলেন নি। কিন্তু বাবার কতটা অসুবিধা হবে ভেবে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। একদিন আউট পাস নিয়ে আরো দুজনের সাথে ইন্দোর গেলাম। আমার সাধ্যের মধ্যে যতটা ভালো কেনা সম্ভব ততটা ভালো একটা কোটের কাপড় কিনে নিয়ে এলাম। ব্যারাকে সকলে দেখে বলল বেশ ভালো হয়েছে। সে বছর ছুটিতে গিয়ে বড়দাকে দিয়ে এলাম। বড়দা তখন বড় বৌদি ও ছেলেমেয়েদের সাথে বাসা করে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের কাছে কোন জায়গায় থাকে। কোটের কাপড় টা দেখে খুব আনন্দ করল, আমাকে অনেক আশীর্বাদ দিল যে আমি যেন ভাল থাকি। বলে এলাম তুমি কোটটা তৈরি করে নিও। আমাকে বলল চিন্তা করিসনা আমি ঠিক তৈরি করে নেব। সে বছর ছুটি শেষ করে আবার ইউনিটে চলে গেলাম। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খোঁজ নিতাম কোটটা তৈরি হয়েছে কিনা। প্রতিবার একই উত্তর আসতো এখনো হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই করতে দেওয়া হবে। পরেরবার ছুটিতে গিয়ে বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোট তৈরি করার মজুরি কত ? আমাকে জানালো মোটামুটি এত টাকা লাগবে। সে বছর বড়দার কথামতো সেই টাকা বড়দাকে দিয়ে এলাম, যেন ঠিকমতো কোটটা তৈরী করে নেয়। বাড়ি আসার পর মা, ছোড়দি যখন জানলো পুরো ব্যাপারটা তখনই তারা বলল টাকাটা বড়দার হাতে না দিলেই ভালো করতাম। গল্প এখনো বাকি আছে। সে বছর ছুটি শেষ করে আবার ইউনিটে ফিরে গেলাম। আবার বড়দাকে চিঠি দিলাম কোট তৈরির টাকাও তো তোমাকে দিয়ে এসেছি এবার ওটা তৈরি করে নিও। বড়দা যথারীতি জানাল যে হ্যাঁ এবার নিশ্চয়ই করে নেব। আবার পরের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বড়দার সাথে দেখা করতে গিয়ে জানলাম সে কোট কিন্তু এখনও তৈরি হয়নি। কোট-এর টাকা খরচ করে ফেলেছে সেই জন্য করতে পারেনি। তবে শীঘ্রই করে নেবে। সঙ্গে আমি তৈরি করার টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। বড়দাকে বললাম কোটের কাপড়টা নিয়ে চল, কোন দর্জিকে দিয়ে করবে তার কাছে চলো, আমিও যাব। বড়দা হাসতে হাসতে কোটের কাপড় নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে দর্জির কাছে গেল। বড়দার মাপ নেওয়ার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কত মজুরি ? দর্জি বিল করে জানালো এত টাকা পড়বে। বড়দার সামনে পুরো টাকাটা দর্জিকে দিয়ে দিলাম। ফুল পেমেন্ট লেখা বিলটা বড়দা কে দিয়ে বললাম এই তারিখে ডেলিভারি ডেট আছে কোটটা নিয়ে নিও। পুরো টাকা দেওয়া আছে, তোমাকে টাকা দিতে হবে না। বড়দা সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল। একটু বেশি রকম চুপ হয়ে গিয়েছিল। এই হল বড়দার কোট তৈরীর গল্প। মৌ-তে বেশ আনন্দেই চাকরি করছিলাম। ওখানকার কাজটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। মাঝে মাঝে মাঠে যেতাম ফুটবল খেলতে। সেই নাইজেরিয়ান ছেলেটা এলে আরো ভালো লাগত। ছেলেটার পায়ে খেলা আছে। ওর সাথে খেলতে ভালো লাগত। মাঝে ৮-১০ দিনের জন্য সিমেন্স ৪০০ ওয়াট Tx নিয়ে বাইরে এক্সারসাইজে যেতে হল। অন্য জায়গার তুলনায় এখানে এক্সারসাইজটা অনেক কম। বেশ কয়েকদিন মজা করে বাইরে কাটিয়ে এলাম। মৌ-তে ফিরে আসার পর মেজর পান্ডে বলে SODE-র একজন অফিসার ছিলেন তিনি আমাকে বললেন যে, রবিবার তো আপনাদের ছুটি থাকে ওই সময় Tx হল খুলে যদি সেটের ট্রেনিং টা একটু দেখিয়ে দেন তো ভালো হয়। যখন ক্লাস চলে অত

লোকের সাথে ঠিক বুঝতে পারিনা। উনি খুব ভাল লোক ছিলেন। আমার ফোরম্যান কে বলে তিন-চারটে ছুটির দিন ওনাকে প্র্যাকটিক্যাল করিয়েছিলাম। Tx-হলে যতগুলো সেট আছে সবগুলোর টিউনিং করিয়ে দেখিয়েছিলাম। আর এক অফিসার মেজর পি. আর উপাধ্যায় অনুরোধ করলেন একইভাবে। ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করতে উনি বললেন তোমার যদি ছুটির দিন কাজ করতে আপত্তি না থাকে তুমি দেখিয়ে দিতে পার। আসলে মিলিটারিতে নিজের ইচ্ছাতে কিছু করতে পারবো না। তাই কিছু করতে গেলে সিনিয়র কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়। মেজর উপাধ্যায়কেও খুব যত্ন করে সেটের কাজ দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পরে ওই মেজর উপাধ্যায় সাহেব নর্দান কম্যান্ড সিগন্যাল রেজিমেন্টে আমি যখন আমার চাকরির শেষ পোস্টিং এ গেলাম, তখন উনি আমার বড় উপকার করেছিলেন। আমার ডিসচার্জ এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসব। দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে গেল। আমাদের ইউনিট থেকে একটু দূরে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের বলা হলো পূজার চারদিন সব বাঙালির ছুটি। তারা ইচ্ছে করলে পূজামণ্ডপে ওই চার দিন দুপুর ও রাত্রি খাওয়া দাওয়া করতে পারে। তবে রাত্রি ১১ টার মধ্যে ইউনিটে ফিরে আসতে হবে। অনেক বাঙালি অফিসার ছিলেন। সিভিলে অনেক বাঙালি। সকলে মিলে ওই চারদিন গান নাটক ও খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। আমরা সকালবেলা টিফিন করে, সাইকেল নিয়ে ওখানে চলে যেতাম। সারাদিন খুব আনন্দ করে রাত্রে ফিরে আসতাম। বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে লুচির ব্যবস্থা ছিল। ওখানে যত বাঙালি ফ্যামিলি রেখেছিল তারাও সকলে নিমন্ত্রিত। পরিবেশন আমাদের নিজেদেরকে করতে হত। সেদিন মনে আছে ঠাকুর বিজয়া হওয়ার আগে, সিদ্ধি খাওয়ানো হয়েছিল সকলকে। কেউ কেউ বেশি খেয়েছিল। আমারও একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমাকে আবার পরিবেশনের কথা বলল। লুচি পরিবেশনে কোনো অসুবিধে নেই। আমি লুচির ঝুড়ি নিয়ে ঘুরতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম আমার অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে। আমি অন্যের কাছে লুচির ঝুড়ি দিয়ে সরে এলাম। কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া করে একজনকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিটে ফিরে এসেছিলাম। সেইদিন সাইকেল না চালিয়ে টেনে টেনে নিয়ে এসেছিলাম। চারদিন বেশ আনন্দে কাটিয়ে আবার কাজের জোয়ারে ফিরে এলাম। সেই ট্রান্সমিটার হল আর ফুটবল গ্রাউন্ড। ওখানে বাঙালি বাদ দিয়ে দুজন মারাঠা বন্ধু ছিল। B. S. Khot আর ভোঁসলে বলে একটা ছেলে। মৌ-তে ইউনিট এর বাইরে মহিষের খাটাল ছিল। দুধ বেশ সস্তায় পাওয়া যেত। আমি বেশিরভাগ দিন বৈকালে খেলার মাঠে থাকতাম। তাই ভোঁসলে কিংবা খোট আমার দুধটা এনে দিত খাটাল থেকে। আমাকে প্রায় জোর করে দুধ খাওয়াতো ওরা। পয়সাটা আমাকে দিতে হত। সেটা আমার পক্ষে একটু অসুবিধা হত। ওদের সেকথা বোঝাতে পারতাম না। দুধ আনার জন্য একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঝোলানো ক্যান কিনেছিলাম, সেটা এত বছর পরেও বাড়িতে আছে। MCTE-তে ফুটবল টুর্নামেন্ট আরম্ভ হল। টুর্নামেন্ট আরম্ভ হলে সব কাজ থেকে রেহাই পাওয়া যেত। শুধু খেলা বাদ দিয়ে আর কোন কাজ থাকত না। MCTE Football Team - এর ছবি এখনো বাড়িতে টাঙানো আছে। খেলা চলাকালীন আমার পোস্টিং অর্ডার চলে এসেছিল। অর্ডার এসেছে সিগন্যাল রেকর্ড জব্বলপুর থেকে। এখানে অনেকদিন হয়ে গেছে। ৪৫৬ সিগন্যাল রেজিমেন্টে পোস্টিং হয়েছে। সেটা উধমপুর ইউনিটে আছে শুনলাম। এখান থেকে উধমপুর যেতে হবে। সুযোগ বুঝে কাশ্মীর ঘুরে আসব। এইসব চিন্তা করে আনন্দ হচ্ছে। বাড়িতেও জানিয়ে দিলাম এখান থেকে উধমপুর যেতে হবে। তবে কবে এখনো জানা যায়নি। এখানকার কাজটা বেশ ভালো ছিল। বেশ আনন্দে ছিলাম। এখানে তমলুকের সুমিত দাস আছে। তারও পোস্টিং হয়েছে কোন একটা জায়গায় যেন।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

নিলয় মুখার্জী, জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ পাল

ভান

পর্ব ২

মুখবন্ধ –

কোরোনার এই দুঃসময়ে গৃহবন্দী অবস্থায় প্রায় সকলেরই যখন মনটা ধাঁধাগ্রস্থ, মনের মধ্যে অস্থির-অস্থির ভাব, আবার হঠাৎ "হাতে এখন অনেক সময়, কী করা যায়", এইরকম এক চিন্তার মেঘ লুকোচুরি খেলছে, তখনই তড়াক করে আইডিয়াটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আচ্ছা, কয়েকজন মিলে একটা গল্প বানালে কেমন হয়? প্রত্যেকের নিজস্ব টুকরো টুকরো ভাবনার রং দিয়ে সেই গল্পের তরীটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটু করে ভাসিয়ে দিতে হবে পাঠক সমুদ্রের দিকে। তাহলে আর দেরি কেন? যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ।

সঙ্গে গল্পের কারিগররাও ছেনি, হাতুড়ি, পেরেক যার যা সংগ্রহে আছে, নিয়ে হাজির। আগে থেকে নিয়মমাফিক পরিকল্পনা কিছু করা হয়নি, একেবারে "ফ্রি ফ্লো" ভাবেই চলুক না হয় আমাদের গল্পের নৌকা। নদীর বাঁকে অর্থাৎ পরিচ্ছেদের অন্তে ও আরম্ভে এক একজন কারিগর কলম তুলি নিয়ে প্রস্তুত। লিখতে বসে বুঝলাম, গন্তব্য জানা নেই। আমরা শুধু সৃষ্টিসুখের উল্লাসে থাকব মত্ত, let's enjoy the journey।

যেহেতু পাকাপাকি পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না কী হবে এই গল্প, কী হবে তার ধাঁচ বা তার ছাঁচ, তাই এইটুকুই বলা, নাও তুলে নাও তোমার কলম, সৃজনীশক্তির পাল দাও খুলে, দেখা যাক কোথায় যায় এই তরী। হয়ত হাওয়ার স্রোতে ভেসে যাবে কোনও ভান-করা বা আদৌ ভান-না করার দেশে।

হলও তাই। আমরা সাতজনা সাতটি রঙে সাজিয়ে তুললাম আমাদের experimental এই project। একেক জনের লেখার পর চলল আলোচনা আর তুমুল তর্ক বিতর্কের ঝড়। আমাদের তরীটি কিন্তু খুব শক্ত পোক্ত। এত জল ঝড়ে নড়লে চড়লেও, দিকভ্রষ্ট হয়নি একটুও। গল্পের গোড়ার কথায়, যে ট্রেন এসে থেমেছিল নদীর কিনারে হাওড়া স্টেশনের ধারে এই গল্পের কারিগরদের তরীতে, তারপর কত ঘাটের জল খেয়ে তা শেষে এসে মিলল সাত লেখকের ছোঁয়ায় সাতরঙা রামধনুর এক দেশে, তৈরি হল এই গল্প "ভান"। পাকাপাকি জায়গা করে নিল "কাগজের নৌকা"য়।

এখানেই গল্প আর গল্পকথার বীজবপনের গল্প। উদ্যোগটি পাঠকদের ভালো লাগলে তবেই আমাদের এই অভিনব প্রয়াস সার্থক।

– সুমিতা বসু

পাঁচ – নিলয় মুখার্জি

নীলাঞ্জন শ্রীময়ীর খবরটা পেল, দুদিন বাদে। অরুণিমার কাছ থেকে। ওদের সম্পর্কটা আজকাল একটা রুটিনের মত হয়ে গেছে। সেই তিনতলার ছাদের ঘর, সেই দুপুরবেলা ঘন্টা দুয়েক। তাও ওরা অন্য প্রেমিক-প্রেমিকাদের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে। কিন্তু এই প্রাইভেসির জন্যই বোধহয় সম্পর্কটা অনেকটা বিয়ে করা সংসারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অরুণিমা আলতো করে নীলাঞ্জনের কাঁধে মাথা রাখল। মাস দুয়েক যাবৎ অরুণিমা লক্ষ্য করছে নীলাঞ্জন যেন অন্যমনস্ক, সেই আগের মত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না আর। আড়চোখে একবার নীলাঞ্জনকে দেখে নিয়ে অরুণিমা বলল,

"শ্রীময়ী ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙ্গেছে – মাথায় চোট পেয়েছে ....."

"সে কী! কী সাংঘাতিক, কবে? কোথায় আছে এখন? বাড়ি না হাসপাতাল?"

"ভীষণ দরদ দেখছি? আমার অ্যাক্সিডেন্ট হলে এরকম দরদ দেখাবি তো?"

"তোর দরদ দেখানো উচিত – ও তো তোর বন্ধু।"

"সে তো স্কুলে ছিল – কলেজে তো তোর সঙ্গে পড়ে – তুই দরদ দেখা।"

উত্তর না দিয়ে অরুণিমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে নীলাঞ্জন বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ফিল্ডওয়ার্ক আছে, ল্যাব আছে, সামনে পরীক্ষা। অরুণিমার মুখ ভার। একটা জিনিস অরুণিমা কিছুতেই বুঝতে পারে না। কেন নীলাঞ্জন দু'বছর কম্প্যুটার পড়ার পর সব ছেড়ে দিয়ে জুওলোজিতে ঢুকেছে – কিছুতেই বুঝতে পারে না !

আবার সেই একই ঝগড়া শুরু হল, যেটা একশোবার আগে হয়েছে। "তোদের জুওলজিতে যত ঝামেলা – বন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পোকামাকড় কুড়িয়ে বেড়াও, কোথায় পেঙ্গুইন না কি ছাই, তাই নিয়ে লড়ে যাও – বললাম কত করে কম্প্যুটারটা না ছাড়তে।"

অরুণিমা বলল। "দ্যাখ – আমি অন্য রকম। স্কুলে পড়ার সময় আমার সম্বন্ধে তোর এই জিনিসটাই ভাল লাগত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত দেখছি তোর জন্য ছাপোষা কেরানিই ভাল।"

"আমি কি তোকে কেরানি হতে বলেছি ? কম্প্যুটার পড়লে ভাল চাকরি পেতিস।"

"আজকালকার কম্প্যুটার আর ব্রিটিশ আমলের কেরানির মধ্যে বিশেষ তফাত নেই।"

খানিক জোর করে রাগ দেখিয়েই নীলাঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অরুণিমাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বার কয়েক টান দিতে মাথাটা আবার ঠিক কাজ করতে লাগল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীলাঞ্জন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সবাই দৌড়চ্ছে। যত রাজ্যের অমল বিমল কমল নিজেদের দৈনন্দিন কাজের পেছনে ছুটছে – ছুটুক। ও ইন্দ্রজিৎ !

কিন্তু শ্রীময়ীর খবরটা ওকে খোঁচা দিচ্ছে। ঠিক আছে তো মেয়েটা ? কলেজের প্রথম দিনই নীলাঞ্জন বুঝতে পেরেছিল শ্রীময়ী একটু অন্যরকম। শ্রীময়ীদের অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু গতানুগতিক টাকার পেছনে ছুটতে চায় না ও। বাকি সবাই জুওলোজি পড়তে ঢুকেছে ডাক্তারি পায়নি বলে কিন্তু শ্রীময়ী আলাদা। সে মৌলিক স্যারের প্রিয়পাত্রী কি এমনি এমনি ? গোটা ক্লাসের মধ্যে ওরাই দুজন, যারা সাবজেক্টটাকে ভালবাসে। স্যার যৌনতা নিয়ে ওঁর রিসার্চের কথা বললে অন্যরা মুখ টিপে হাসে। কিন্তু শ্রীময়ী আর নীলাঞ্জন বাকরুদ্ধ হয়ে শোনে।

তারপর সেদিনকার ঘটনাটা নিয়েও তো কথা বলতে হবে। বাসে ওঠার আগে নীলাঞ্জন শ্রীময়ীকে ফোন করল। ফোনটা সোজা ভয়েসমেইলে চলে গেল।

*****

রাত এগারোটার সময় শ্রীকান্ত যখন ওদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে ঢুকল, মা তখনও জেগে বসে আছে খাবার বেড়ে দেবে বলে। ত্যাগ, ভালবাসা ? ভাত খেতে খেতে শ্রীকান্ত কথাটা তুলেই ফেলল, গত চার পাঁচ দিন ধরে মায়ের মুখে যে প্রশ্নটা ফুটে উঠেছে বারবার, তার জবাব।

"প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার নিচ্ছি।"

মমতা কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। বহু দিনের কষ্টের সংসার। টাকা যে গাছে ফলে না, মমতা জানেন। শ্রীময়ীর সার্জারি যে সস্তা নয়, সেটাও জানেন। শেষে শুধু একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল। খানিক ক্লান্তি, খানিক স্বস্তি, খানিক নতুন আশংকা।

"মেয়েটাকে নিয়ে আমার চিন্তা হয় খুব।"

"চিন্তা করে আর কী করবে ?"

“আসলে এত টানাপোড়েনের মধ্যে বড় হয়েছে – ও যেন কোনোকিছুর মধ্যেই আস্থা খুঁজে পায়না।”

“সেটা স্বাভাবিক। ছোট বেলা থেকে ওর বন্ধুদের তুলনায় ও কিছুই পায়নি। সবসময় সস্তার জামা কাপড়, কোনো শখ আহ্লাদ নেই, অন্যদের দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকা।”

“সে তো তোর বেলাতেও একই শ্রীকান্ত। তুই তো ওরকম হোসনি ?”

“দায়িত্ব, দায়িত্ব, বুঝলে ? ঠিক তোমার মত। হাল না ধরলে সব ভেসে যাবে, এই ব্যাপারটা আমি বুঝে গিয়েছিলাম অনেক দিন আগেই।”

*****

বেলা কর্মকার আর অনুপ সরকার আবার মুখোমুখি একদিন হাওড়া স্টেশনে। অ্যাক্সিডেন্টের পর এক সপ্তাহ মতন হয়েছে। বেলা একটু উত্তেজিত ভাবেই অনুপকে ডেকে নিল। কথায় কথায় জানা গেল, হাসপাতাল থেকে বেলাকে খবর দেয়া হয়েছে। মেয়েটির নাম শ্রীময়ী। ওর দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে বেলার। ভদ্রলোক খুব কৃতজ্ঞ। অনুপের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি জেনে বেলা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে অনুপ বলল, “ইয়ে, মানে আমি ভুল নম্বর দিয়েছিলাম। মানে – কোনও ঝামেলায় জড়াতে চাইনি। আসলে ওকে আমি চিনি। শ্রীময়ী আমাদের অ্যানিম্যাল শেল্টারে ভলান্টিয়ার ছিল।”

অনুপের সব খুলে বলার ইচ্ছে একেবারেই নেই, কিন্তু বেলা জোরাজুরি করতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলতে শুরু করল। “আসলে, ও পশুদের যৌনতা নিয়ে রিসার্চ করতে চায়।”

“কী বলছ অনুপদা ?”

“হ্যাঁ, আমিও প্রথমে খুব একটা পাত্তা দিইনি – আজকালকার মেয়ে, বুঝতেই পারছ – কত কী মাথায় ঘোরে ওদের !”

“তারপর ?”

“তারপর এক উদ্ভট ব্যাপার –” বেলার হাত থেকে মুক্তি পাবে না দেখে অনুপ আর কিছু লুকোবার চেষ্টা করল না।

“কুকুরদের মধ্যে যৌনতা সবাই লক্ষ্য করে থাকে, কিন্তু এইরকম একনিষ্ঠ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা বোধহয় অস্বাভাবিক।”

কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। একদিন শ্রীময়ী অনুপকে কী বলেছিল, সেটা শুনে বেলা আকাশ থেকে পড়ল।

“আর ও কী বলল জান ?

বলল, অনুপদা, কাউকে দেখে আপনার উত্তেজনা জাগে না ? অথচ সেটা স্বীকার করতে চান না পাঁচজনে কী ভাববে বলে। নিজেকে মধ্যবিত্ত ভালমানুষ বলে চালিয়ে যান। আপনার যেটা চাই, সেটা পাবার অক্ষমতাকে ধর্মভীরুতা বলে নিজেকে বাহবা দেন। হয়নি এমন কোনওদিন ?”

বেলা আঁতকে উঠল, “কী সর্বনাশ !”

ভদ্রতার খাতিরে লোকে অনেক কিছু বলে যা ঠারেঠোরে ইঙ্গিতে। আর কোনও ভান না করে কথাটা আরেকজনকে বলতে পেরে অনুপ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। আর কাউকে বেলা যেন না বলে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনুপ চলে গেল।

*****

শ্রীময়ী চমকে জেগে উঠলো। অ্যাক্সিডেন্ট, সার্জারি, মাথাব্যথা, ব্যথার জন্য ওপিঐড – সব কিছু মিলিয়ে গত সপ্তাহটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে। চিন্তাভাবনাগুলো এলোমেলো ভাবে এসেছে গেছে। দাদার মুখ, মৌলিকের মুখ, ছায়ার মত আরেকটা মুখ। সব যেন ভেসে ভেসে আসছে আর যাচ্ছে।

শ্রীময়ী উঠে বসতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে স্লিং দিয়ে ঝোলান পায়ের অবস্থাটা নজরে পড়ল। অসম্ভব। হাসপাতালের যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে প্রথম ভোরের ফিকে আলো একটু একটু করে চুইয়ে ঢুকছে। সন্ধিক্ষণ। চিন্তার জন্য প্রশস্ত সময়। হ্যাঁ, শ্রীময়ীকে চিন্তা করতে হবে।

দিনের পর দিন শ্রীময়ী দেখেছে, মা না খেয়ে তার ভাত বাবা ও দাদাকে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, খিদে নেই। কেন ? পুরোনো কাপড় ছিঁড়ে গেছে, বলেছে, “আমার শাড়ির শখ নেই – তোরা কেন্ না, আমি পয়সা দিচ্ছি।” কেন ? যেটার চাহিদা স্পষ্ট, কেন সেটা চেপে রাখা ? জীবনের সঙ্গে কেন এই লুকোচুরি ? মাকে জিজ্ঞেস করলে রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত, সতী সাবিত্রীর ত্যাগের গল্প। সমস্ত ব্যাপারটা মেকি মনে হত শ্রীময়ীর। একটা বিরাট মিথ্যের ওপর যেন গোটা সমাজটা দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ, শ্রীময়ীর চাহিদা আছে। ছোট বেলায় খেলনা, পুতুলের চাহিদা, তারপর জামা জুতোর চাহিদা, এখন তার ওপর জুড়ে বসেছে অদম্য যৌন চাহিদা। কিন্তু মানুষের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, ওরা তো শুধু মিথ্যে কথা বলবে। পশু ও অন্য প্রাণী, যাদের সমাজ আমাদের মত নয়, একমাত্র তারাই শ্রীময়ীকে এই চাহিদা সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিতে পারবে। শ্রীময়ীর জুওলোজির দিকে আকৃষ্ট হবার এটাই প্রধান কারণ।

আরও একটা ব্যাপার আছে। কল্পনা। যেটা নেই, সেটা কিরকম হতে পারে, তার একটা আন্দাজ। সেই আন্দাজের রসদ জুগিয়েছিল অরুণিমা আর স্কুল পালিয়ে নীলাঞ্জনের সঙ্গে ওর কীর্তিকলাপ। দিনের পর দিন, অরুণিমার গল্প শুনে, শ্রীময়ী নীলাঞ্জনের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ স্পষ্ট মানসচক্ষে দেখতে পেত। তার কথাবার্তা, হাবভাব, পছন্দ সমস্ত শ্রীময়ীর মনের মধ্যে গাঁথা। তাই কলেজে যখন প্রথম আলাপ হল, মনে হল কবেকার চেনা মানুষ। ওর বিদ্রোহী ভাব ও জুওলজির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট করেছিল শ্রীময়ীকে। নিজের সঙ্গে ভান করে না শ্রীময়ী।

আর রইল স্যারের ব্যাপারটা। উনি বিজ্ঞানী মানুষ। অনেক জ্ঞান, কিন্তু ওঁর মধ্যেও ভান আছে, হয়ত সবচেয়ে বেশি ভান। ভালমানুষ সেজে পড়াতেন, কিন্তু প্রথম যেদিন শ্রীময়ীর পিঠে আলতো করে হাত রাখলেন, শ্রীময়ী বুঝতে পেরেছিল সব। এক অদ্ভুত জেদ চাপল শ্রীময়ীর। এই ভান ভেঙে দেবে ও। শ্রীময়ী বুঝতে পারল, মৌলিক স্যার হচ্ছে ওর পারফেক্ট রিসার্চ সাবজেক্ট। কী করে মানুষ তার অন্তরঙ্গ চাহিদা ও সামাজিক প্রচ্ছদ দুটোই বজায় রাখতে পারে, এই নিয়ে রিসার্চ। তার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল না। একটু হেসে কথা বলতেই যৌন কামনা হুশহুশ করে বেরিয়ে পড়ল। শ্রীময়ীর হাসি পেত দেখে যে কত সাবধানতার সঙ্গে মৌলিক স্যার সবকিছু ব্যবস্থা করতেন। কত চিন্তা, কত হিসেব। এমন কি শ্রীময়ীর গলায়, ঘাড়ে যৌনক্ষতচিহ্ন কী করে মেকআপ দিয়ে ঢাকতে হবে তার উপদেশ পর্যন্ত। জামাকাপড় আগে থেকে খুলে অন্যত্র ঝুলিয়ে রাখা, যাতে শ্রীময়ীর চুল জামায় আটকে না থাকে। পারফিউম লাগানো চলবে না, আরও কত কি। নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম। খানিকক্ষণের জন্য বাঁধন হারাতে কতরকমের নিয়মের বাঁধন।

নাঃ – শ্রীময়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, মৌলিক স্যার ইজ নট দ্য ফাদার !

আধুনিক সমাজে বোধহয় একটি জায়গাতেই সব বাঁধন খসে যেতে পারে। নাইটক্লাব। আলো আঁধারির আলেয়া, উত্তেজক বাজনা। কথা বলার উপায় নেই। কোনও রকম ইন্টেলেকচুয়ালিজম চলবে না। নাচিয়েদের ভিড়ের মধ্যে কেউ কাউকে দেখছে না। শুধু শারীরিক সংস্পর্শ। চাহিদাই এখানে রাজা, ভান করার দরকার নেই। বেশ কয়েকবার এইভাবে নগ্ন কামনার সম্মুখীন হয়েছিল শ্রীময়ী নীলাঞ্জনের সঙ্গে। অরুণিমা জানে না।

শ্রীময়ী নীলাঞ্জনের সেল ফোনের নম্বরটা ডায়াল করল।

ছয় – জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীকে আজ একটু বেশীই চুপচাপ মনে হচ্ছিল কৃত্তিকার। তার হতাশা আর অনুযোগমিশ্রিত বাক্যবাণ নতুন কিছু নয় মৌলিকের কাছে। মৌলিকের প্রতিক্রিয়াটা সাধারণত হয় কিছুক্ষণ শোনার পর। একটা পুরোনো লাইটারের মত, ফ্যুয়েল প্রায় ফুরিয়ে আসার সময় হাজারবার বোতামটা টেপার পর যেমন দপ করে উঠে নিভে যায়, ঠিক সেইরকম।

আজ তা নয়। কৃত্তিকা ভেবেছিল যে ক্রেয়ন আনতে নির্ঘাত ভুলে যাবে আর অর্ককে সামলাতে ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। ভোলেনি। অর্ক কিছুতেই জড়িয়ে ধরে আদর করতে চায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন বাবা পছন্দমত কিছু উপহার নিয়ে আসে। আগামীকাল ভোর পাঁচটার সময় উঠে ওর ছবি আঁকা শুরু হয়ে যাবে।

কৃত্তিকা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ককে ওর ঘরে শুইয়ে দিয়ে আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। মৌলিককে এই দায়িত্বটা কিছুতেই দেয়া যায় না। ছেলেটা চিৎকার চেঁচামেচি করে মাথায় করে। বাবার স্পর্শ ও আদরের আধিক্য অর্ককে দিশেহারা করে তোলে। মা যে শুইয়ে দিয়েই চলে যায়, সে যেন তার জন্য কৃতজ্ঞ।

অর্কর ঘর থেকে বেরিয়েই সারাদিনের জমে থাকা রাগ কৃত্তিকার মুখ দিয়ে যখন গলগল করে বেরোচ্ছে, ও খেয়াল করেনি যে মৌলিক ওর অপেক্ষায় চুপচাপ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ আর চোখদুটোর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খাওয়ার জোগাড়। কী বলছে এতদিনের চেনা মানুষটা, ঠিক ঠাউরে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়বার বলাতে কানে ঢুকল, "আই ওয়ান্ট আ ডিভোর্স !" পাথরের মত ত্রিশ সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল কৃত্তিকা। সহ্য করতে না পেরে মৌলিক চোখ নামিয়ে নেয়।

এবার কৃত্তিকা উত্তরটা ভেবেই দিল, "আচ্ছা ! এতদিনে ভান না করে সোজা কথাটা বলার সাহস হল তাহলে ? গুড ফর ইয়্যু! কিন্তু আমার উত্তরটা দিতে যে এক সপ্তাহ সময় চাই। এই যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষা তোমার কপালে লেখা আছে। গুড নাইট !" মৌলিকের ভ্যাবাচাকা মুখটাকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে সে। চোখের জল আজ আর বাধা মানল না।

গত এক বছর ধরে মৌলিকের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করছে কৃত্তিকা। কী ও কেন যে সেই ব্যবহারের ফারাক ওর স্বামীর মধ্যে, বোঝানো শক্ত। তবে স্ত্রীর যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সর্বদা সজাগ থাকে, সেই অনুভূতিই প্রকট হয়ে সম্প্রতি জানান দিচ্ছে। আজ অনুপের সঙ্গে ফোনে কথা হওয়ার পর কৃত্তিকার সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল।

গভীর ভালবাসায় ডুবে বাড়ির সবার অমতে সে বিয়ে করেছিল মৌলিককে। অসংকোচে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। দিম্মা, বাবা, মা, দাদা, কেউ বিয়েতে সায় দেননি। অথচ ও তখন মৌলিককে জীবনসাথী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেটা কি শুধু ওর সাহেবের মত রং ও নীল চোখের আকর্ষণে ? কিছুতেই না। ও নিজেও তো কাঞ্চনবর্ণা। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশীই লম্বা। মৌলিকের সমান সমান।

ছেলেটির অকৃত্রিম হবার সাহসই কৃত্তিকাকে টেনেছিল। ছোটবেলা থেকে সে নিজেও সোজা এক কথার মানুষ। মনে এক, মুখে আর এক, এই সাংসারিক বুদ্ধিটা সে কোনদিন রপ্ত করতে চায়নি। কলেজে বহু ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তবে তাদের ওই পলিটিক্যালি কারেক্ট মনোভাব কৃত্তিকা প্রত্যাখান করেছে। মৌলিক ছিল অনন্য। ক্লাসে প্রফেসরকে খুশী করা ত দূরের কথা, ও আনন্দ পেত তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে।

কৃত্তিকা একদিন নীল আইশ্যাডো লাগিয়ে এল। দু'তিনজন ছেলেদের "কী সুন্দর দেখাচ্ছে" বলে আড়ালে অর্থপূর্ণ হাসাহাসি করাটা ওর চোখ এড়িয়ে যায়নি। আর মৌলিক ? বলেছিল, "একদম কার্টুনের স্মার্ফের মত দেখাচ্ছে।" কৃত্তিকা তো চুম্বকের মত আরও আকৃষ্ট!

এই গুণটাই ওকে সাহস যুগিয়েছিল দুদিকের বাড়ীর সম্পূর্ণ অমতে এই সহপাঠীর সঙ্গে জীবনের সুতো শক্ত করে বেঁধে নিতে। বিয়ের পর প্রেমের বন্যায় দুজনে পুরোপুরি ডুবে গেল। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে ওরা গ্র্যাজুয়েট করল। মৌলিক নামকরা ইয়ুনিভার্সিটিতে পি এইচ ডি প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন পেয়ে একেবারে ডগমগ।

সংসার চালাবার জন্য কৃত্তিকা চাকরি নিল। অনুপ কে জি থেকে ওর বন্ধু। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে একটা এন জি ও খুলেছিল, অ্যানিম্যাল শেল্টার কাম রিসার্চ সেন্টার। কৃত্তিকাকে অনুপ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। তাই ও যখন সেন্টারটা ম্যানেজ করার কথা বলল, কৃত্তিকা তো আনন্দে হাবুডুবু। মৌলিকের পড়াশোনা, রিসার্চ, কৃত্তিকার কাজ, এই ব্যস্ততার মাঝেও ওদের বিবাহিত জীবন মধুর ভাবে কাটছিল। সবচেয়ে ভাল লাগত বিছানায় মৌলিক যেভাবে ধৈর্য ধরে ওকে স্বর্গে পৌঁছে দিত। ক'জন স্বামী এভাবে সম্মান দেয় স্ত্রীকে ! তবে ওরা প্রোটেক্শন নিত কারণ সন্তানকে আনার জন্য কয়েকটা বছর অপেক্ষা করাটাই সমীচীন মনে হয়েছিল।

পি এইচ ডি শেষ হল ছ'বছরে। পেঙ্গুইন সম্বন্ধে ওর থিসিস টপিক প্রফেসারকে খুব ইমপ্রেস করেছিল। তাঁর সঙ্গে পেপারস্ লিখে বেশ নামও করল মৌলিক। কিন্তু প্রফেসার চাইলেও নানা পলিটিক্সের কারণে ওই ইয়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করার অফার তো পেলই না, এমনকি কলকাতার কোনও বড় কলেজেও না। বাধ্য হয়ে মৌলিক ছোট একটি কলেজে জুনিয়র লেকচারার হয়ে জয়েন করল।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খুশির খবরটা ওদের পাগল করে দেয়। তারপর, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! তিনমাসের চেক আপের সময় ডাক্তার কৃত্তিকার অ্যামনিয়োটিক ফ্লুয়িড টেস্ট করলেন। ভ্রূণের বিকৃত হবার সম্ভাবনা। ব্যাপারটা ভাল করে বোধগম্য হওয়ার আগেই কৃত্তিকা লক্ষ্য করল মৌলিকের পরিবর্তনটা। ও পাগলের মত জোর করতে লাগল গর্ভপাত করানোর জন্য। কৃত্তিকা গররাজি হওয়ার পর থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ। কথা বলা প্রায় বন্ধ, শারীরিক ঘনিষ্ঠতার সব উৎসাহ যেন রাতারাতি উধাও। অথচ এই সময়েই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। অর্ক জন্মাল। মৌলিক একবারও আদর করল না, কোলে নিল না। কৃত্তিকার মনে হল একটা দুঃস্বপ্নের মাঝে ও হারিয়ে যাচ্ছে। বছরখানেক পর অর্কর অটিজমের চিহ্ন ফুটে উঠল। তবে যেদিন সে হামাগুড়ি দিয়ে বাবার পা বেয়ে কোলে উঠতে চাইল, মৌলিক শেষপর্যন্ত আর বিমুখ থাকতে পারেনি।

হঠাৎ একদিন রাতে কৃত্তিকাকে কাছে টানে মৌলিক। মিষ্টি করে বলে, "আর চিন্তা নেই। এবার আমরা যতখুশি সেক্স করতে পারি। আমি গত সপ্তাহে vasectomy করে নিয়েছি। আর defective child হবার কোন চান্স নেই।" কৃত্তিকা পাথর। এ কে ? ও একটা জানোয়ারের সঙ্গে ঘর করছে ? না, জানোয়ারেরও অধম। এতবড় অসম্মান ! যৌথ জীবনের এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্ত্রীকে ছাড়া নিয়ে নেওয়ার মানে যে একটিই হয়। কৃত্তিকার মতামতের মূল্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ মৌলিকের কাছে। অর্ক তাহলে ওর বাবার চোখে শুধুই "defective child"। এরপর মিলন তো দূরের কথা, ওর পক্ষে স্বামীকে ছোঁয়াও অসম্ভব ছিল। চারবছর হয়ে গেছে।

গত একবছর ধরে মৌলিক মাঝে মাঝেই কনফারেন্স আছে বলে রাতে বাড়ি ফেরে না। একবার ওর শার্ট-প্যান্ট ধুতে দিতে গিয়ে দেখে পকেটে একটা কন্ডমের খালি প্যাকেট ও একটা হোটেলের বিল। কৃত্তিকা বড় ক্লান্ত। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করার মত উদ্যম অথবা ইন্টারেস্ট কোনওটাই ওর ছিল না।

আজ বিকেলে হঠাৎ অনুপের ফোন। অর্ক হবার পর বাধ্য হয়ে চাকরিটা ছাড়তে হয়েছিল। ওকে তো সাধারণ কোনও ক্রেশে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এক বছর ধরে দিনে চারঘন্টার জন্য একটা স্পেশাল ক্লিনিকে যায়। সেখানে অটিস্টিক বাচ্চাদের থেরাপি হিসেবে আঁকা, ব্যায়াম, গান ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় যাতে ওরা আর একটু বড় হলে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে অন্তত কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। অনুপের ফোনটা এল অর্ককে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর। চাকরি ছাড়লেও প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু এখন অনুপের গলায় একটা সংকোচ স্পষ্ট। ওর জিজ্ঞাস্য যে কৃত্তিকা আজ এ বি পি আনন্দ চ্যানেল দেখেছে কি না। দুপুর থেকে না কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট বারবার দেখাচ্ছে।

একটি যুবতী মেয়ে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে সাংঘাতিক জখম হয়েছে। অনুপ তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। কৃত্তিকা বুঝতেই পারছিল না এই মামুলি ঘটনাটা এত বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করার কারণটা। পরমুহূর্তেই পরিষ্কার। অনুপ হাওড়া স্টেশনে ওই প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনটা ইন করার সময় ও এক ঝলকের জন্য মৌলিককে ওই মেয়েটির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। মেয়েটিকে অনুপ ভাল করে চেনে। নাম শ্রীময়ী, ওর শেল্টারে কাজ করত। স্বভাবচরিত্র মোটেই ভাল নয়। মৌলিকের কলেজেরই ছাত্রী। মৌলিক অবশ্য অনুপকে দেখতে পায়নি। ঘটনাটা ও প্রথমে কৃত্তিকাকে জানাতে চায়নি। তবে শেষপর্যন্ত বলে দেওয়াটাই ঠিক মনে হল। স্বামী-স্ত্রীর চিড় খাওয়া সম্পর্কের কথা তো কৃত্তিকা ওকে বলেছে। লোকটা যে এভাবে ওকে ঠকাচ্ছে, তা ওর জানা উচিত। তবে এবার অনুপ অবাক ! শ্রীময়ী কোন হাসপাতালে আছে কৃত্তিকা সেটা জিজ্ঞাসা করল।

*****

আজ শ্রীময়ী একটু ভাল আছে। ছ'দিন হয়ে গেল। বোধহয় দু'দিন পর ছেড়ে দেবে। অরুণিমার আসার কথা। ওর সঙ্গে ভান করতে হবে। এত কমপ্লিকেশন ভাল লাগে না। সেক্স ব্যাপারটা কেন যে এরা পশুদের মত স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না ! সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আয়াকে বেল দিল। বেডপ্যান চাই। আয়ার পেছন পেছন আর একজন খুব ফর্সা আর লম্বা মহিলা ঢুকলেন। আয়া তার বাজখাঁই গলায় শুরু করল, কেন ও ডাক্তারের দেওয়া ওষুধগুলো খাচ্ছে না, এতে ওর বাচ্চার ক্ষতি হবে, ইত্যাদি। শ্রীময়ী আয়াকে তাড়াতাড়ি থামায় এবং আর একটু পরে ফিরে আসতে বলে।

আয়া বেরিয়ে গেলে মহিলা নিজের পরিচয় দিলেন, “আমি কৃত্তিকা, মৌলিকের স্ত্রী। দুঃখিত, তোমার এই দুর্ঘটনার জন্য। এখন একটু ভাল তো ? শুনলাম ছেড়ে দেবে শীগগিরি।” শ্রীময়ী তো অবাক ! কী বলবে বুঝতে পারছে না। “আমি বেশি সময় নেব না। একটি কথাই জানতে চাই। তুমি সত্যিটা বলার সাহস রাখ, আশা করি। তুমি কি মৌলিকের সঙ্গে রিলেশনশিপে আছ ?” ভদ্রমহিলার তীব্র চাহনির থেকে শ্রীময়ী চোখ সরিয়ে নেয়। ওর মুখে নির্লিপ্ততা স্পষ্ট।

“না, না। ওঁর সঙ্গ ভাল লাগে। এইটুকুই ...” চোখ ফেরাতে আর কৃত্তিকাকে দেখা গেল না।

*****

রাতে অর্ক ঘুমোবার পর খাবার টেবিলে কৃত্তিকার উদাসীন উক্তি, “ডিভোর্স চাইছ কিসের উপর ভর করে ? যাকে মন বিলিয়ে দিলে, সেই শ্রীময়ী তোমায় ভালবাসে না। আর একটা কথা, মেয়েটি প্রেগনেন্ট।”

মৌলিকের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃত্তিকার মনে হয়, আজ রাতে ওকে একা থাকতে দিলে একটা অঘটনের সম্ভাবনা আছে।

সাত – পার্থ পাল

কৃত্তিকার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হবার চার দিন বাদে শ্রীময়ী ছাড়া পেল। যদিও পায়ে প্লাস্টার কাটতে আরও ছ'সপ্তাহ। ততদিন বাড়ী থেকে বেরনো বারণ। এই ছ'সপ্তাহ "গোকুলে বাড়িছে যে", তার কী রকম বহিঃপ্রকাশ হবে সে চিন্তা মাথার মধ্যে যেন সবসময় বিনবিন করছে। বাধ্যতামূলক গৃহবন্দিত্ব অনেক সময় মানুষকে অন্তর্মুখী করে। তার ওপর ট্রেনের তলায় চলে যেতে যেতে বেঁচে ফিরে আসা। এক সপ্তাহের পর শ্রীময়ীর মনে হতে লাগল, তেইশ বছরের এই জীবনে সে কী অ্যাচিভ করতে পেরেছে ? একটা ডিগ্রি ? কয়েকটা পুরুষ মানুষের সুপ্ত ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে নিজের বাসনা পূরণ ? এই জন্যই কি তার এই পৃথিবীতে আসা ? তার পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হল কানে এক নতুন ফিসফিসানি – "শুধার যা, বেটি, শুধার যা।"

তাদের বাড়িতে একটাই মাত্র কম্প্যুটার, বেশ বড়সড় ডেস্কটপ। তিনটে ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। ক্রাচ বা দরজা খোলার শব্দ পেলেই মা হাঁকপাঁক করে ছুটে আসে। তাই শ্রীকান্ত সেই উইকেন্ডে বাড়ি এলে শ্রীময়ী বলল, "দা'ভাই, কম্প্যুটারটা আমার ঘরে এনে কানেক্ট করে দিবি ? ওয়াইফাই সিগন্যাল পেয়ে যাব মনে হয় আমার ঘর থেকেও।" ঘরে আটকা পড়ে থাকা বোনের করুণ মুখ দেখে শ্রীকান্তর কাজটা করে দিতে পেরে ভালই লেগেছিল। তারপরের বেশ ক'দিন শ্রীময়ী ইন্টারনেটে প্রচুর ঘোরাঘুরি করল। এর মধ্যে মৌলিক বা নীলাঞ্জন কাউকেই তার ফোন করার ইচ্ছে হয়নি। কেউ কেউ অবশ্য বার দু-এক ফোন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শ্রীময়ী ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে চার সপ্তাহের মাথায় ফোনটা তুলে সে একটা নম্বর ডায়াল করল।

*****

কৃত্তিকাকে সেদিন ফোন করার পর থেকে অনুপের একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কাজটা কি ঠিক হল ? কৃত্তিকার প্রতি অনুপের মনোভাব কৃত্তিকার অজানা নয়। আকারে ইঙ্গিতে অনুপ অনেকবারই বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে তখন মৌলিকের প্রেমে পাগল। অনুপের মনে হয় কৃত্তিকার বাবা-মা বিয়েটা মৌলিকের সঙ্গে না হয়ে অনুপের সঙ্গে হলে খুশিই হতেন। অনুপ বনেদি বংশের ছেলে, পড়তির দিকে হলেও নিজেদের ব্যবসা, কলকাতার আশেপাশে অনেকগুলো বাড়ি, যদিও অনাদরে ভগ্নদশা। নানারকম সমাজ কল্যাণের কাজে অরাজনৈতিকভাবে যুক্ত থেকে কিছু কিছু অব্যবহৃত জায়গা জমির সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছে আস্তে আস্তে। আর সব থেকে বড় কথা কোনও অহঙ্কার নেই এবং ভীষণ প্রচার বিমুখ। ট্রেনে বাসে চড়তে কোনও আপত্তি নেই। কৃত্তিকা কি ভাবল যে অনুপ তার আর মৌলিকের আধভাঙ্গা সম্পর্ককে পুরো ভেঙ্গে দিতে চায় ? ঈশ্বর জানেন এই মুহূর্তে কৃত্তিকা যদি কোনও একটা ইঙ্গিত দেয় তাহলে অনুপ সব ফেলে ছুটে যাবে কৃত্তিকা-উদ্ধারে। এই ভাবতে ভাবতে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। কারও কোনও পাত্তা নেই। এমনই অব্যবস্থিতচিত্ততার মধ্যে একদিন একটা ফোন এল।

"... তোমার তো অনেক চেনা জানা ..." ও প্রান্তের কথা শুনতে শুনতে অনুপ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলে কী মেয়েটা !

*****

মৌলিকের সঙ্গে ঝামেলা পুরোদমে শুরু হবার সময় থেকে কৃত্তিকার বারবার মনে হয় যে সবার অমতে মৌলিকের সুন্দর চেহারা দেখে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। অনেক লোকের মনে কষ্ট দিয়েছে সে। তার এই অবস্থা, অর্কর এই জীবন, এ বোধ হয় তার শাস্তি। অনুপ খুব ভাল বন্ধু। ও যে তাকে অন্য ভাবে দেখে, কৃত্তিকা তার নারীসুলভ অনুভূতিতে অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিল। যদিও অনুপ কোনও দিন তার সামাজিক সৌজন্যর বাইরে যায়নি। মৌলিককে বিয়ে করার পরও অনুপের সেই সহজ বন্ধুত্বের কোনও পরিবর্তন না দেখে কৃত্তিকা একটু হতাশই

হয়েছিল। কিন্তু অনুপের সঙ্গ ছাড়তেও সে চায়নি। মৌলিকের কলেজের আয়কে ভরতুকি দেয়ার জন্য অন্য কোথাও না গিয়ে সে অনুপের অ্যানিম্যাল শেল্টারে কাজের অফারটাই এক বাক্যে নিয়ে নিয়েছিল। অনুপ ফোন করে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া মেয়েটার কথা বলে দিয়ে ভালই করেছে। ভাগ্যিস সে গিয়েছিল হাসপাতালে। মৌলিককে "রাজা তোর কাপড় কোথা" তো বলতে পেরেছে। মৌলিক তার কাছ থেকে এবং অর্কর দায়িত্ব থেকে মুক্তি চায়। মৌলিকের কাছে তার আর চাওয়ার কিছু নেই। মা-বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা অর্কর মুখই দেখে উঠতে পারেননি এখনো। এমতাবস্থায় একজনই ভরসা। কিন্তু তার আগে কিছু কাজ করে নেওয়া দরকার।

সেদিন অর্ককে ঘুম পাড়িয়ে কৃত্তিকা মৌলিককে জানিয়ে দিল যে সেও ডিভোর্স চায়। মিউচুয়াল সেট্‌ল্‌মন্ট। অর্ক তার কাছে থাকবে। মৌলিককে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যদিও ফ্ল্যাটটার মালিকের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হতে এখনো ছ'মাস বাকি। তবে কৃত্তিকা এবং অর্ক যাতে এই ফ্ল্যাটেই সেই ছ'মাস থাকতে পারে তার ব্যবস্থা মৌলিককে করে দিয়ে যেতে হবে। বিনিময়ে কৃত্তিকা বা অর্কর প্রতি মৌলিকের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কৃত্তিকাকে অবাক করে দিয়ে মৌলিক অন দ্য স্পট রাজি হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিকা কি অন্য কিছু হবে ভেবেছিল ? মিয়াঁ বিবি রাজি – অতএব এর পরের ধাপ গুলো অতি দ্রুত পেরোল তারা। দু'মাসের মধ্যে মৌলিক চলে গেল। চন্ডীগড় না কোথায় একটা চাকরি পেয়েছে। তা ভাল। এবার পাঞ্জাবী ছুকরিদের পালা। কিন্তু তার হাতে আর মাত্র চার মাস সময়। এর মধ্যে দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা একটা করে ফেলতে হবে।

*****

যে ফোনটার আশা করে অনুপ হা পিত্যেশ করে বসেছিল, সে ফোনটা অবশেষে এল মাস তিনেক পরে। সব কথা খুলে বলে কৃত্তিকা অনুপকে বলল, "আমাকে একটা থাকা-খাওয়ার জায়গা করে দিবি রে ? বিনিময়ে কাজ করে দেব, যা বলবি।" এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে অনুপ বলেছিল, "– তোর পুরোনো কাজটা তো আছেই। আর শেল্টারের জমিটায় আমাদের যে বাড়িটা রয়েছে, যেটার ক'টা ঘর আমরা অফিস হিসাবে ব্যবহার করি, সেটা আজ থেকে ম্যানেজার্স অফিসিয়াল রেসিডেন্স।"

*****

হাওড়া স্টেশনের সেই দুর্ঘটনার পর বছর দেড়েক কেটে গেছে। গর্ভাবস্থার লক্ষণ ফুটে ওঠার আগেই, প্লাস্টার কাটার তিনদিন পর শ্রীময়ী বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। একটা ইমেল-এ সে সব কথা শ্রীকান্তকে জানিয়ে আসে যাবার আগে, আর মাকে লেখা একটা চিঠিতে। "আমি প্রেগনেন্ট। চিন্তা করো না। আমি মরতে যাচ্ছি না। বাঁচতে যাচ্ছি। বাবা কে, তা জানতে চেও না, হয়ত আমি নিজেও জানি না। যদি ক্ষমা করতে পার তাহলে ঝাড়খন্ডের এই উইমেন্স সেন্টারে এসে দেখে যেও আমি ভাল আছি। থানা পুলিশ করতে যেও না। অনুপদার কল্যাণে এই যোগাযোগ, ওকে আর মুশকিলে ফেল না।"

শ্রীকান্ত আর মমতা মাঝেমাঝেই দেখে যান মেয়েকে। সনকা হবার পর তো আরও ঘন ঘন। আদিবাসী মেয়েদের স্বল্প ঋণ প্রকল্পে হাঁস, মুরগী, ছাগল এমন কি গরু কিনে দিয়ে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে শ্রীময়ী। গঙ্গাফড়িং-এর সেক্স লাইফ বা পেঙ্গুইনের মেটিং ফিলসফির থেকে অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রির দিকেই এখন তার বিশেষ নজর। আর আছে সনকা। না, এখানে তাকে একেবারে অমুকের মত দেখতে হয়েছে বলার কোনও সুযোগ নেই।

ওদিকে এক বসন্তের দুপুরে, আতপ্ত হাওয়া আর কোকিলের ডাকে প্ররোচিত হয়ে বুঝি একদিন কৃত্তিকা একটু

প্রগলভতা প্রকাশ করে ফেলেছিল। অফিসে তখন ও আর অনুপ একা। "আমরা কি নতুন করে ঘর বাঁধতে পারিনা ?" আলোছায়াময় একটা হাসি দিয়ে অনুপ বলেছিল, "তুই বললি এটাই অনেক। কিন্তু রক্ষে কর – যদি মৌলিকের মতো আমার সঙ্গেও তোর একদিন খটাখটি লাগে – তখন কিন্তু আর তোকে নতুন থাকা খাওয়ার জায়গা দিতে মন চাইবে না। তাছাড়া এই তো বেশ আছি, সেই প্রাইমারি স্কুল থেকে যেমন ছিলাম ? মন্দ কি ? যতদিন থাকা যায়।"

কৃত্তিকা জানত না তখনও। অনুপের প্যানক্রিয়াসে ক্যানসার ধরা পড়েছে সম্প্রতি। মারা যাবার আগে অনুপ শেল্টারের ওনারশিপ অর্কর আর কৃত্তিকার নামে করে দিয়ে যায়। কৃত্তিকাকে তারপর থেকে সাদা শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরতে দেখা যায়নি।

– সমাপ্ত –

নিলয় মুখার্জী – বস্টন এলাকায় বসবাস করেন। রোবট-এর সাহায্যে সার্জারি করলে তার data- analytics কিরকম হতে পারে তাই নিয়ে মাথা ঘামান। মাঝে টুকটাক লেখালিখি করে মনে প্রাণে নারদমুনি হবার লোভ ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় – পরিবারের সঙ্গে সুদূর অ্যামেরিকায় কিশোরী জয়ন্তীর ঘরবদল হলেও কলকাতা, বাঙালীত্ব, বাংলাভাষার প্রতি প্যাশন কমা ত দূরের কথা, বরং আরও প্রবল হয়েছে। পেশায় বস্টন শহরে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে অধ্যাপনা, তবে মাতৃভাষায় লেখালিখির চেষ্টা চলে একটু অবসর পেলেই। তার উপর মঞ্চাভিনয়, শর্ট ফিল্ম, আবৃত্তি, নাটকের স্ক্রিপ্ট ও রান্নার রেসিপি লেখা, এসব নিয়ে দিন ভালই কাটে। ২০০৩ সাল থেকে বস্টনের "সেতু" নাট্যগোষ্ঠীর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত। স্বরচিত গল্প দিয়ে বানানো ও ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া "শেষ ঠিকানা" চলচ্চিত্রটি প্রযোজনার সময় ছুটি নিয়ে বছরখানেক কলকাতা বাসের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা নিয়েও লেখার ইচ্ছে আছে। স্বামী গৌতম ও নাতি নাতনীদের নিয়ে জীবন এখন ভরপুর।

পার্থ পাল – কম্পিউটার সায়েন্স-এ পি এইচ ডি, কিন্তু তাঁর ভালবাসার বিষয় ইতিহাস আর মানব জমিন। বুভুক্ষু পাঠক, ভ্রমণ এবং ভোজন বিলাসী। নয় নয় করে তেত্রিশ বছর নিউ ইংল্যান্ড প্রবাসী। লেখেন লিখতে ভাল লাগে বলে, ফলের আশা বিশেষ করেন না।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

চল নিধুবনে

পর্ব ২

ডাক্তারবাবুর মেয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ল। একেবারে শেষ অবস্থা। সব রকমের চেষ্টা করেও বাঁচল না। তার একমাসের মাথায় সব কিছু স্ত্রীর নামে করে দিয়ে উনি এখানে চলে এলেন। শান্তদার সঙ্গে আলাপ ছিল। আরশিনগর নিয়ে হাসিঠাট্টা করতেন। শেষে নিজেই বেশ কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতে বাধ্য হলেন। শান্তদাকে নাকি বলেছিলেন "আমি পালাতে চাই। আত্মহত্যা করতে পারছি না। তোমাদের আরশি নগরে আমার একটা জায়গা হবে?" চিত্রাদি ওর পূর্বপরিচিত। উনিই টাকাটা ব্যাংকে জমা করেন। সেই টাকার সুদ থেকেই এখানকার রুগীদের ওষুধ, দরকার মত পথ্যের ব্যবস্থা হয়।

ছোটবেলায় ওনার মা ওনাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান। এখন মাঝেমাঝে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন। ভারি আওয়াজ, সুরে বসা গলা। বেশ লাগে ওনার রেওয়াজ। নবীনা দরজার কাছে গিয়ে শুনল উনি হারমোনিয়ামে থেমে থেমে গাইছেন "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার ...।" স্বরলিপি দেখে তুলছিলেন গানটা। ওকে দেখে লজ্জা পেয়ে থেমে গেলেন।

জানতে চাইলেন, "কার কী হল আবার?"

চা খাওয়াবেন বলেও বিদেশের অবস্থার কথা শুনে ব্যাগ হাতে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন। ওনাকে রুগীর ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে ওকেই। ডাক্তারবাবু দু'একজন ছাড়া খুব একটা কারো সঙ্গে মেশেন না। বাড়িও যান না। নিজের বাড়ির বাগানে অনেক গাছ করেছেন। নিজের মনে সঙ্গীতচর্চা করেন। সেসব নিয়েই থাকেন। গাছ থেকে ছিঁড়ে একটা গাছের লাউ ওকে দিলেন। ও হাতে নিয়ে সেই থেকে ঘুরছে ওটা, ঝুমুরদের দিয়ে দেবে। কিন্তু ঝুমুরদের সঙ্গে কাল নদীতে স্নান করতে যাবার যে কথা ছিল, তা হয়ত আর হবে না।

বিদেশের জন্য চিন্তা হচ্ছিল ওর। জ্বর নামবে তো? ডাক্তারবাবু বললেন তেমন কিছু নয়। এ আমি সামলে নিতে পারব। কোন টেস্ট লাগবে না। উনি ওষুধ দিলেন। ছেলেটার জ্ঞান আসতে একটু গরম দুধ আর বিস্কুট খাইয়ে ও ফিরেছে। দুধ আর বিস্কুটের প্যাকেট ওদের এনজিওর। এখানে আসার সময় কিছু কিছু জিনিস ও নিয়ে আসে সবার জন্য। যেমন ন্যাপকিনের প্যাকেট এসেছে ঝুমুরদের জন্য। অল্পবয়সী মেয়ে আরো কয়েকজন থাকলেও শান্তদার এনজিওর আওতায় তারা আসেনা। তাদের কিছুটা হলেও সামর্থ্য আছে।

ঝুমুরদের খবর দিতে হবে। রাতে ওরাই খেতে বলেছে। কিন্তু বিদেশের কাছে থাকার কেউ নেই। কে জানে, আবার জ্বর আসে যদি! বিদেশ হেনাদির কাছে খায়। আজ হয়ত উনি ওকেও খেতে বলবেন। এখানে ওর স্থায়ী কোন বাড়ি নেই। ও যেহেতু দু'তিন দিনের জন্য আসে, যে বলে তার বাড়ি'ই খায়, ঘুমায়। নাহলে ঝুমুর, মনুয়ারা তো আছেই।

এখানে একটা জিনিস নিয়েই ও চিন্তিত থাকে। সেটা হল মশা। চারপাশে জঙ্গল থাকায় মশার খুব উপদ্রব। ঝুমুরদের ও মশারি কিনে দিয়েছে। এলে সেখানেই ও ঢুকে যায়। কিন্তু আজ ওকে যদি বিদেশের ওখানে থাকতে হয়, মশারি ছাড়া চলবে কী করে?

ঝুমুরদের ওখানে ব্যাগ রাখতে গিয়ে খুব মজা হয়েছিল।ওদের বাড়ির পেছনে একটা ভাঙা ভাঙা পাঁচিল আছে। সেটায় উঠে ওরা আমগাছে চড়ে। সেবারে যাবার সময় ও বলেছিল "এই আমগাছটার ডালটা কেমন সোজা দেখেছিস? ওই ডালে

যদি একটা দোলনা বাঁধা যায়, খুব ভালো হয়, তাই না ?” এবারে ওদের বাড়িতে ঢুকতেই ওরা কাপড় দিয়ে ওর চোখ বেঁধে দিল। তারপর পেছনে নিয়ে গেল। চোখ খুলে ও অবাক ! চমৎকার একটা দোলনা আমগাছের ডালে দুলছে। কাঠের কারুকার্য্য করা পিঁড়ি লোহার চেনে লাগানো। পিঁড়িটা খোলা যায়। দোলনার এপাশের দড়ি থেকে ওপাশের চেন অবধি একটা লাল রেশমের ফিতে বাঁধা।

ঝুমুর একটা কাঁচি এনে বলল, নাও উদ্বোধন করো। আনন্দে ওর চোখে জল এসে গেল। মনুয়া আর ঝুমুর তখন আদুরে গলায় বলছে , “কবে থেকে আমরা অপেক্ষা করছি। তুমি আসছই না। আমরাও চাপতে পারছি না।”

দোলনা বানিয়েছে শালু। শালু আর বলাকাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে ওরা। কিন্তু দোলনায় চাপতে দেয়নি। ফিতে কাটার পর পালা করে তিনজনে দুলল খানিকক্ষণ।

ওদের দোলনায় দোলার পর্ব শেষ হতে না হতেই এলো ভূষণদা। ভূষণদার গল্পটা ওর জানা নেই। ওর এখানে প্রথম পা ফেলার আগে থেকেই ভূষণদা এখানে আছে। আগের জীবনে ভূষণদা কী ছিল ও জানেনা। তবে এখানে মালির কাজ করে। যদিও সবটাই ইচ্ছেমত।

রবিবারে হেনাদির সঙ্গে লাইব্রেরির বাগানে ফুলগাছ বসায়, সার দেয়। আগাছা উপড়ে দেয়। লাইব্রেরির চারপাশে ভূষণদার তত্ত্বাবধানে ভারি সুন্দর একটা বাগান হয়েছে। অন্যদিনগুলোয় সকলের বাড়ি পালা করে গিয়ে ফুলগাছ বসায়। রাতে এখানেই থাকবে বলে আজ ঝুমুরদের বাড়ি এসেছে।

ঝুমুর বলল “কী মজা, আজ ভূষণদা খিচুড়ি বানাবে, আমরা খাব।”

ভূষণদা হাসল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, “আজ বৃষ্টি হবেনা। আর বৃষ্টি না হলে তো আমি খিচুড়ি রাঁধিনা।”

আগেরবারে যখন এসেছিল দুপুরে মেনু ছিল অদ্ভুত। উচ্ছে ভাতে, আলু ভাতে, ঘি আর ভাত।

সেবারে ঘি'টা ও এনেছিল। তাতেই ভারি খুশি হয়েছিল মনুয়া আর ঝুমুর। মনুয়া বলেছিল, “কতদিন ঘি খাইনি দিদি। তুমি খাওয়ালে।”

এখানে এটাই খুব খারাপ লাগে ওর। সবাই সব কিছু ছেড়ে এসেছে। কিন্তু ও যখন এদের মাঝে এসে পড়ে, তখনই এদের স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবন দেখে ওর খুব মনখারাপ হয়ে যায়। তবে ও সেটা বয়ে বেড়ায় না। ঝেড়ে ফেলে সঙ্গেসঙ্গে।

এসব নিয়ে একদিন কথা হয়েছিল শান্তদার সঙ্গে, একদম একান্তে। খুব গম্ভীর ভাবেই শান্তদা ওকে বলেছিলেন , “তুমি আর যেওনা ওখানে।”

“ সে কি ? কেন ?” ও অবাক হয়েছিল খুব।

“আমি জানতাম, তাই তোমাকে স্থায়ীভাবে এখানকার বাসিন্দা হতে বারণ করে ছিলাম। হিমালয়ের অনেক গুহায় এখনও অনেক সাধু থাকেন, তোমার জানা আছে ?”

“জানি।”

“তারা ওই প্রচন্ড ঠান্ডায় কেন ওখানে বসে আছেন ? ভালো কেন, অনেকসময় কোন খাবারই পান না। পোশাক নেই, বিছানা নেই, তবু কেন ? ... এ ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?”

“সাধনা। তারা ঈশ্বরের সাধনা করছেন।”

শান্তদা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, “ঠিক বলেছ। তবে বলাটা না বুঝেই বলেছ। জীবনের মানে সবার কাছে এক নয় কেন জানো, সবাই সেই পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়ায়নি, যেখান থেকে পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। আবার পাহাড়ের সেই পাদদেশেরও সন্ধান পায়নি যেখান থেকে ওঠা শুরু করতে হয়। আমার মনে হয় এখানকার অপ্রাপ্তি দেখে কষ্ট হলে এখানে তোমার বারবার না আসাই ভালো।”

শান্তদার কথায় ওর খুব মনখারাপ হয়েছিল। পরে বুঝেছিল ও, একদম ঠিক কথাই বলেছেন উনি। সব ছেড়েছুড়ে যে মানুষ অজ্ঞাতবাসে যায়, তার আলাদা সন্ধান থাকে, আলাদা খোঁজ। তাকে ও নিজের মাপকাঠিতে বোকার মত মাপতে গিয়েছে কেন ?

সেবার বিকেলে বৃষ্টি হতে ভূষণদা এসেছিল খিচুড়ি রাঁধতে। শালু আর বলাকাও এসেছিল। সবাই মিলেই খাওয়া হয়েছিল খিচুড়ি, কড়কড়ে কাঁকড়োল ভাজা । মোটা চালের খিচুড়িতেও ঘি ঢেলে ভালো সোয়াদ এনেছিল ভূষণদা। খেতে বসে হাত চাটছিল সবাই। ভূষণদা যাবার সময়, ঘি-এর শিশিটা ওরই হাতে তুলে দিয়েছিল ঝুমুর। ভূষণদা না নিয়ে বলেছিল, আমি নিয়ে গিয়ে কী করব ? এখানেই থাক। আবার একদিন খিচুড়ি হলে দেওয়া যাবে।

নবীনা ভেবেছিল ও সত্যিসত্যি ভীষণ বোকা ! নাহলে ওই তুচ্ছ অপ্রাপ্তি নিয়ে মাথা ঘামায়। এবারে আবার ওদের জন্য ঘী এর শিশি এনেছে ও। তবে ব্যাগেই পড়ে আছে। হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

# # #

আরশিনগরের কিছু রীতি নীতি আছে। রীতি নীতি গুলোই তৈরি হয়েছে মানুষের দিকে তাকিয়ে। চা, চাল, ডাল, আটা, তেল, নুন, হলুদের একটা মোটা রেশন প্রতিমাসে সবাইকে দেওয়া হয়। বিনাপয়সায়। শান্তদার এন জি ও র প্রতিমাসে দেওয়া অর্থ সাহায্য আর আরশিনগরের অর্থবান মানুষদের সম্মতিতে তাদের জমা টাকার সুদ, এ বাবদ খরচ করা হয়। তাছাড়া যারা উল বুনে ভালো সোয়েটার বানাতে পারে, ছিট কেটে মেসিনে ফ্রক, সালোয়ার কামিজ, ব্লাউজ তৈরি করতে পারে তারা সাইজ অনুযায়ী সেসব বানিয়ে রাখে। উল, ছিটকাপড়, মেসিন প্রয়োজন মত যোগান দেন শান্তদা। চিত্রাদি উদ্যোগ নিয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ে গ্রীটিংস কার্ড, কাপড়ের ব্যাগ আর নানাধরণের পুতুল, রাখি বানাতে শেখান লাইব্রেরিতে। বড় ছোট সবাই যোগ দেয় সেই উদ্যোগে। শান্তদার গাড়িতেই সেসব শহরে চালান যায়। কিভাবে বিক্রি হয় জানেনা ও। তবে বিক্রির টাকা সমবায়ের ভান্ডারে জমা হয়। সেই টাকা থেকেই আবার উনি কাঁচামালের যোগান দেন। লাভের টাকা যায় রান্নার মসলা, সাবান, আরো সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। সবাই নিজের নিজের কোটামত এসব পায়, তবে অতিরিক্ত নেয় না কেউ। এখানে এরকম ব্যবস্থা চালু করার কথা শান্তদাই প্রথম বলেন। তারপরে হেনাদি আর চিত্রাদি সেটার রূপরেখা তৈরি করে সবাইকে জানিয়ে দেন। তবে যারা চায় তারাই কাজে অংশগ্রহণ করে। জোর করে কারুর ওপর কোনকিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয়না।

আসলে চিত্রাদি, হেনাদি আর শান্তদা এই অদ্ভুত নগরের অলিখিত গার্জেন। মাঝেমাঝেই ওনারা নিজেদের মধ্যে আরশিনগরের একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবার লাগে। থাকার জায়গা, জামাকাপড়, এগুলোও লাগে। যারা ঘর ছেড়ে একেবারে শূন্য হাতে বেরিয়ে এসেছে, তাদের বাঁচাতে গেলে সামান্য কিছু যত্ন লাগে। দিনের পর দিন একজন মানুষের শুধু সেদ্ধ ভাত খেয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। একই পোশাকে থাকলেও অসুখ করে। এরকম একটা ব্যবস্থা গড়ে তাদের শ্রম তাদের কাজেই লাগানো যেতে পারে। দিনের পর দিন কাজকর্ম ছাড়া একভাবে বসে থাকাও ক্লান্তিকর। বীজ, সার পেলে, বাড়ির পাশের জমিতে সব্জী ফলানো যায়। সে সব্জীও সবাই পেতে পারে। এখানে তাই হয়। জমি মোটামুটি খারাপ নয়। বাড়ির চারপাশে গাছের ডাল কেটে বেড়া দিয়ে অনেকেই লঙ্কা, বেগুন, টমাটো, ঢেঁড়স, আলু, পিঁয়াজ ফলায়। শীতকালে বেশ বড় বড় বাঁধাকপি, ফুলকপি হতে দেখেছে ও। নিজের রেখে, একে ওকে দিয়েও বাড়তি থাকলে সেসব লাইব্রেরিতে জমা দিতে হয়। ওখান থেকেই অন্যরা প্রয়োজন মত নিয়ে যায়।

তবে এখানে এসব লেনদেনে কোন পয়সার গল্প নেই। নিজেদের মধ্যে জিনিসের বদলে জিনিসের বিনিময় চলে। কেউ আলু দিয়ে বিনস্ নেয়। কেউ আবার বিনস্ দিয়ে আলু নেয়। কোনও মুনাফার গল্প নেই। চক্রাকারে যা যেখান থেকে আসছে, তা আবার সেখানেই ফিরে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম যে কঠোর কৃচ্ছ সাধনের গল্প ছিল তা আর ভোগ করতে হয়না কাউকে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ আরাম স্বাচ্ছন্দ্য এখন সবাই অর্জন করেছে। তবু কেউ কেউ আছে, যারা, কোন কাজই করেনা। যৌথ পরিবারেও এমন মানুষের জন্য অন্যরা কিছু কিছু মায়া দয়া প্রশ্রয় দেয়। নাহলে সংসার চলেনা। এখানেও কিছু দেয় না শুধুই নেয় এমন মানুষদের সমর্থন দেন হেনাদি, চিত্রাদি। বলেন, "থাক্ না। ছেড়ে দাও। ওর ইচ্ছে নাহলে জোর করো না।"

মীরা যেমন। সুন্দরী। গায়িকা হিসেবে নাম ছিল ওর। এখানে চলে এসেছিল একদম একা। সঙ্গের ঝোলাতে ছিল কৃষ্ণের এক নয়নভোলানো মূর্তি। ও কোনও কাজ করেনা। শুধু সরস্বতী পুজোর সময় ও একহাতে পুজোর সবকিছু করে দেয়। যেকোন সময় ওর বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে কৃষ্ণের ভজন শোনা যায়। অনেকে বলে ও অনেক টাকা দান করেছে এখানে। অনেকের ব্যাপারেই বিশেষ করে যেসব বিখ্যাত লোকেরা এখানে বরাবরের মত চলে এসেছেন এই অর্থদানের গল্প হাওয়ায় ভাসে। হয়ত কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। তবে নবীনা কখনও শান্তদার কাছে এসব জানতে চায়নি। ও জানে এই কাজে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারটায় শুধুই প্রশ্রয় আর ভালোবাসা আছে। সেখানে কে অর্থদান করেছে সেটা বড় কথা নয়।

শান্তদা মাঝেমাঝে বলেন, "এরা যে কোথা থেকে এখানকার খবর পায়, জানিনা। কুট্টি, শান্তিনিকেতন থেকে এখানে চলে এসেছে। ভাবতে পারো?"

কাজ না করার জন্য কখনও-সখনও কাউকে কাউকে ডাকা হয়। বোঝানো হয় যে অন্যের জন্য কিছু না করলে সে তোমার জন্য করবে কেন?

হেনাদি সবসময় বলেন, "থাক্ ছেড়ে দাও। নিজের ইচ্ছে নিয়ে আসুক। জোর করে কিছু করানোর দরকার নেই। কারোর বিচার করব না বলেই এখানে আসা। শাসন করা ছেড়েছি অনেক দুঃখে। আর ওকথা ভাবতেও পারিনা।"

ও বুঝেছিল এসবের পেছনে কোনও বিষাদের গল্প আছে, তবে জানতে চায়নি। বিনা কারণে কে আর এসেছে এখানে?

লাইব্রেরির একটা বড় ঘরেই এসব জিনিস দেওয়া নেওয়া চলে। নির্দিষ্ট সময়ে পালাবদল করে সবাইকেই রেকর্ডের খাতা নিয়ে ওখানে বসতে হয়। লেনদেনের ব্যাপারটা সে লিখে রাখে। অদ্ভুত ভাবে চলে কাজটা। কে কী দিল ভান্ডারে তা লেখা হয়না। কী নিল সেটা খাতায় লিখে নিতে হয়।

হেনাদি বলেন দেওয়াটা নিঃশর্তে হোক, তাহলে যারা দিতে পারছে না তাদের মনে নেবার জন্য গ্লানি জমবে না। আজ সমবায়ের ওখান থেকে ঘুরেই ফিরছিল ও। একটা ছোট চালাঘর। ছোট ওই ঘরেই সমবায়ের যাবতীয় জিনিস রাখা থাকে। রেকর্ড করার খাতাও ওখানেই ছিল। বিদেশের জন্য চিনি আর সুজি খাতায় লিখেই নিল নবীনা। ছেলেটাকে রাতে একটু গরম গরম সুজি করে দিতে হবে।

যেতেযেতেই রিমঝিমের সঙ্গে দেখা হল ওর। উল্টোদিক থেকে আসছে মেয়েটা। ওকে দেখেই রিমঝিম দ্রুত এগিয়ে এলো। "আমার নালিশ আছে। তোমরা খিচুড়ি খেলে আমায় ডাকোনা কেন?"

"তুমি খিচুড়ি ভালোবাস বুঝি? আচ্ছা এবার ঠিক খাওয়াব।"

ঠিক বিদেশের বাড়ির সামনেই দেখা। বেশিক্ষণ কথা বলার সময় ছিল না। রিমঝিম আবার কথা বলতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ওকে তো বিদেশের কাছে যেতে হবে।

বিছানায় চুপ করে পাশ ফিরে শুয়েছিল ছেলেটা। চোখ বুজে ছিলনা আর।ও চুলে হাত রাখতেই ফিরে তাকাল ওর দিকে। কী গভীর সেই চাহনি।বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার উলটে শুল বিদেশ।

নবীনা রাতে শোবে বলে একটা ম্যাক্সি এনেছিল সঙ্গে। রুগীর ঘরে রাস্তার কাপড়ে থাকা ঠিক না। কাপড়টা পালটে ঘরে আসতে বড় বড় চোখ করে ওকে দেখল বিদেশ। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "আজ এলে ?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে থাকোনা কেন ?"

"অনুমতি নেই। যাই তোমার সুজি করে আনি। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি তো ?" নবীনা একটু জোর করেই বেরিয়ে আসে। বিদেশের চাহনিটা কেমন কেমন লাগল যেন। একটু কিছু খাওয়াতে হবে ওকে।

হেনাদি রাতে চাউ দিয়েছিল দুজনের। বিদেশ সুজি খেয়েছিল। চাউ সেভাবে খেতে চাইল না।

নবীনা সবটা খায়নি। ওর থেকে কিছুটা আর বিদেশের থেকে প্রায় পুরোটাই ঝুমুরদের দিয়ে এসেছে। ওরা খুব খুশি। বিদেশের চৌকিতে ওর পাশে শুতে সঙ্কোচ হল ওর। মাটিতে শুয়েছিল মাদুরের ওপর চাদর পেতে। বিদেশের জ্বর সামান্য আছে। কিন্তু ঘোর মাখা চাহনি, পায়ের চেটোর ঠান্ডা ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওর জ্বর আসবে রাতে। কাজেই রাতে ওকে একা রাখা যাবেনা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল নবীনার। ও যেন হাওয়ায় ভাসছে। তারপরেই বিছানায়। ও বুঝতে পারল মাটি থেকে ওকে তুলে পাঁজাকোলা করে নিজের বিছানায় শুইয়েছে বিদেশ। তারপর ওকে জড়িয়ে শুয়েছে ছেলেটা। আঁটোসাঁটো সেই বাঁধনে ও আটকে গিয়েছে।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। নিজের দিকে তাকিয়ে খুব লজ্জা হল ওর। বিদেশকে ছাড়িয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। কিছুটা শিশুর ভঙ্গিতে ওর এক স্তনবৃন্ত মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিঃসাড় শুয়ে আছে ছেলেটা।

তাও নবীনা বলে, "একী ? এরকম করছ কেন ?"

"আরাম লাগছে। তোমার ঠান্ডা শরীরে আরও কিছুক্ষণ জুড়িয়ে নিই। বড় জ্বালা করছে শরীর। আর একটু থাকতে দেবে ?"

নবীনা ওকে আরও কাছে টেনে নেয়। তারপর নিজের চোখ বোজে। নবীনার বোজা চোখ ভাসিয়ে দুগাল বেয়ে নোনতা জলের ধারা নেমে আসে।

বিয়ের পর শুধু একটা বাচ্চা চেয়েছিল ও। এতদিনে সে কী ফিরে এলো ?

সকালে বিদেশ বেশ চাঙ্গা। বারান্দায় নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল নবীনা।

সকাল থেকেই ওর চোখে চোখ রাখতে পারছে না ছেলেটা।

"চলে যাবে ?" চায়ে চুমুক দিতে দিতেই না তাকিয়ে বলে ছেলেটা।

"আর দরকার নেই তো।"

"আছে। কিন্তু জোর করি কিকরে ? ভুল করে ফেললাম তো।" গলা একেবারে খাদে। মায়া লাগে নবীনার।

"কোন ভুল করোনি। ওটুকু মাপ করা যায়। তাছাড়া তোমার শরীর ভাল ছিল না তো।"

বিদেশ চায়ের কাপ রেখে, উঠে এসে, ওর হাতটা ধরে একবার। তারপর দ্রুত ঘরে ঢুকে যায়।

রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় হেনাদির বাড়ির পেয়ারা গাছের ডাল থেকে দুটো পেয়ারা নেয় নবীনা। গাছটায় অনেক পেয়ারা হয়েছে। ঝুমুর, মনুয়া পেলে খুশি হবে।

শরীর নিয়ে ছুৎমার্গ ওর কোন কালে নেই। কিন্তু কাল রাতের মায়ায় ও টের পেয়েছে শরীর মরেনি এখনও। খুব ছোটতে মা ওকে আর বাবাকে ছেড়ে যায়। বাবা খুব ভালমানুষ ছিলেন। মায়ের চলে যাওয়া, অন্য মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধা, মেনে নিতে পারেননি একদম। ঈশ্বর আশ্রয় করেও বাঁচেননি তিনি। নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝতে পেরে ঠিক বাইশ বছরে ওর বিয়ে দেন বাবা।

মা চলে যাবার পর গ্রাম থেকে বাবা নিয়ে এসেছিলেন তার অকালবিধবা, সম্পর্কিত বোন হাসি পিসিকে। যাকে ও পিসিমনি বলে ডাকে বরাবর। পিসিমনির কাছে ও সব কিছুই পেয়েছে। পায়নি কোন বৌদ্ধিক সম্বল।

পিসিমনি ওকে আদর করে নবু বলে ডাকেন। ছোটবেলায় পিসিমনির হাত ধরেই ও স্কুলে গিয়েছে। বন্ধুর মায়েদের ওর মা চলে যাওয়ার জন্য কৌতুহল, টিকা টিপ্পুনি সহ্য করেছে। পিসিমনি বলত, "আমি একটা স্কুলের গন্ডি পেরোন মানুষ, তেমন কিছুই জানি না। নবু, বড় কষ্ট হয় রে। তোকে ঠিকমত কিছু শেখাতে পারিনা।"

ওর তখন দশ এগারো বছর বয়স। পিসিমনির মুখে হাত চাপা দিয়ে কথাটা বলতে বারণ করত ও। "তুমি যে আমাকে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে শোনাও। তার বেলা ?"

"দ্যুৎ পাগলি। ওতো সবাই পারে।"

ও পিসিমনির কোলে মুখ গুঁজে আধো আধো গলায় বলত, "আমার ওই ভালো।"

পিসিমনি আসার পর বেশ যত্নে ছিল ওরা। ভাল ছিল। তখনও আসল ঝড় ওঠেনি তো।

পুরনো কথা মাথায় ভিড় করে আসছিল। পাখার বাতাস করে ওড়ানোর মত সবটাই মাথা থেকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল ও।

বিদেশের বাড়ি থেকে ফেরার পথেই কুট্টির সঙ্গে দেখা। কুট্টির বাড়ি দক্ষিণে, আয়নাভেলিতে। তবে দীর্ঘদিন কলকাতায় আছে। ভাল বাংলা বলে। রোদ্দুরের মধ্যে ও লাল শাক নিয়ে ফিরছে কোথা থেকে।

"লাল শাক কোথা থেকে পেলে ?"

"শালিনী দিল। ওর বাগানে অনেক হয়েছে।"

"শালিনীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। তাই না ?"

কুট্টি খুব সরল। কোন ইঙ্গিত বোঝেনা। ও চোখের ওপর একহাত আড়াআড়ি করে রেখে রোদ্দুর আটকাতে আটকাতেই হাসি মুখে বলে, "তোমারও ভাব আছে তো। যাও, তোমাকেও দেবে।"

নবীনা আর কথা বাড়ায়না। যেতে যেতে পেছন ফিরে চেঁচায় "সরষে আর শুকনো লঙ্কা তেলে ফোড়ন দিয়ে রেঁধো। না পারলে ঝুমুরদের বাড়ি নিয়ে এসো, আমি রেঁধে দেব।"

ও পেছন ফিরে আবার দেখে প্রথম বাক্যে চোখ পিট্‌পিট্‌ করলেও দ্বিতীয় বাক্যটা খুশি করে দিয়েছে কুট্টিকে।

# # #

যাওয়ার পথেই পড়ে "ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণ"। ইঁট পেতে তার ওপর সিমেন্ট দিয়ে গোল চাতাল বানানো হয়েছিল। সেই চাতালে লাল রঙ করে দেন মিস্ত্রি কাকা। লাল গোল বেদীতে রঙ দিয়ে সাদা রঙের স্থায়ী আলপনা এঁকেছিলেন চিত্রাদি। ওখানে বছরে একবার সরস্বতী পুজো হয়। পুজোর পৌরোহিত্য করেন সবসময়েই মীরাদি। তাই ওই জায়গাটাকে "ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণ" বলা হয়। ওটার সামনে অনেকটা পরিচ্ছন্ন ঘাসজমি আছে। দর্শকেরা সেখানে বসে। আর যা কিছু অনুষ্ঠান ওই চত্তরেই হয়। আবার অনেকে ওই গোল বেদীতে অনুষ্ঠানের মহড়া দেয়।

আজ বেশ কয়েকজন মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছে শালিনী। শালিনী সবসময় লম্বা হাতার ব্লাউজ পরে। ওর গলায় ডোকরার হার, দুল। হাতে ডোকরারই বালা। ওর এইসব মাটির, পুঁতির, ডোকরার গয়না পরার খুব শখ, লক্ষ্য করেছে নবীনা।

আজকের সাজ অভিনব। সবুজ শাড়ি, লাল সবুজের জংলা ছাপ ব্লাউজ, মাথায় লম্বা বিনুনী। তাতে বেল কুঁড়ির মালা। কানে আর গলায় ডোকরার দুল হার। কপালে বড় লাল টিপ।

দূর থেকেই নজরে এলো মনুয়া আর ঝুমুরকে। ওরাও নাচ শিখছে শালিনীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথ ধরল ও। একটু ঘুরপথে হলেও ওদের নজর এড়ানো যাবে। নাহলে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো ওকে দেখেই নাচ ছেড়ে ছুটে আসত। সেটা মোটেই ভাল হতনা।

শালিনী খুব সুন্দর নাচতে, গাইতে, অভিনয় করতে পারে। এখানে যেকোন অনুষ্ঠানে ও পুরো প্রোগ্রামটাই শিখিয়ে তৈরি করে। তারপরেও ঘোষণার দায়িত্ব নেয়। কুট্টি ভারতনাট্যম শিখেছে। আরশিনগরেই ওর সঙ্গে শালিনীর আলাপ হয়। এখন মনে হয় বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়েছে।

তবে শালিনী খুবই অন্য ধাতুর মেয়ে। ওকে সামনাসামনি যেকোন কথা বলা যায়না। তাই আসল খবর ওর কাছে পাওয়া যাবেনা। শালিনীর পূর্বকথা একমাত্র শান্তদা জানেন। ওর মত বিলাসী, সাজসজ্জায় অভ্যস্ত মেয়ে এখানে কেন এল, এলেই বা সব অসুবিধে মানিয়ে আছে কী ভাবে, কে জানে ? মাঝেমাঝে পূর্ণিমার রাতে শালিনী ওই চাতালে একা নাচে। ভারী সুন্দর সেই নাচ। ওর চোখেও পড়েছে।

শান্তদা মাঝেমাঝে একটা কথা বলেন, "ভেতরে আমরা সবাই এক। খোলস ছাড়ালে একই রকম। আসার আগে ওই নদীতে খোলসটা খুলে আসতে পারলেই ভাল। না পারলেই ফিরে যেতে হবে।"

"খোলস ছাড়ালেই তো বেরোয় আসল চেহারা। কোন লেবু টক, কোনটা মিষ্টি, কোনটা পচা, সব ধরা পড়ে যায় তখনই তো। এক বলছেন কেন ?" তর্ক জুড়েছিল ও।

শান্তদা বলেছিলেন, "ওগুলো তো অর্জন। গাছে থাকতে থাকতে কেউ পেকে মিষ্টি হচ্ছে, কারোর টক ভাব জন্ম থেকে, কাটছে না। আবার কেউ হয়ত পচেই গেল। বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন লেবু। আসলে তো সে লেবুই।"

শান্তদার কথাটা মাঝেমাঝে ভাবলে কেমন ধাঁধা লাগে ওর। তবে ওই কথাটা ভাবলে আর দাঁড়িপাল্লা লাগেনা।

এখানে সবচেয়ে সুন্দরী চিত্রাদি। তুলিতে আঁকা মুখচোখ। ওনার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে কে বলবে ? তপনতনু নাকি একবার ওকে সহবাসের প্রস্তাব দেন। কথাটা ফাজিল পুলক বলেছে ওকে।

ও জানতে চেয়েছিল, "উনি কী বললেন।"

"কী বলতে পারেন বলে তোমার মনে হয় ?"

"জানিনা।"

"সোজা না নয়, বলেছিলেন, এজন্মে আমি বাঁধা পড়ে আছি। পরের জন্মে দেখা হলে ভেবে দেখব।"

হো হো করে হেসেছিল ওরা। চিত্রাদি বরাবর ওদের ফেভারিট। সুন্দরী, সুরসিকা, মেধাবী, সর্ব কর্মে নিপুণা মহিলাটি কেন যে সব ছেড়েছুড়ে এখানের লাল টালির বাড়িতে দিব্যি টিঁকে গেলেন কে জানে। এখানেও উনি প্রতিদিন ভোর চারটে থেকে পাঁচটা বাড়ির বাগানে যোগব্যায়াম করেন। যে কেউ শিখতে চাইলে শেখান। ও একদিন গিয়েছিল। আর যায়নি। এখানে এসেও যদি অত ভোরে বিছানা ছাড়তে হয়, তবে আসা কেন?

শালিনীর মত ওরও ইচ্ছে করে ওই চাতালে একা একা একদিন নাচে। তাতে যদি জমে থাকা সব কষ্টের নিরসন হয়।

শান্তদা ভারি সুন্দর বলেন, "যদি ভাবো জগতে তুমিই সবচেয়ে বেশি দুঃখী, তাহলে তোমার দুঃখের শেষ থাকবে না। আর যখন ভাববে আমার থেকে অনেক বেশি দুঃখ নিয়ে অনেক মানুষ লড়াই করছে ভাল থাকার জন্য, শুধুই বেঁচে থাকার জন্য, তখন তোমার কষ্টের ভার অনেক কমে যাবে।"

এখানে আসতে আসতে একটা যন্ত্রনার মুখ ক্রমশঃ বুজে যাচ্ছে। আবছা হচ্ছে। তবে মুছে যায়নি। ও চেষ্টায় আছে, বিশ্বাসও করে, যে একদিন নিশ্চিত সফল হবে।

আজ ও লাবনীর কাছে যাবে। লাবনীর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। লাবনীর মুখ একেবারে গোল। মুখের চারপাশে থোকাথোকা কালো কোঁচকানো চুল ঘাড় পর্যন্ত এসে থমকেছে। পুরু ঠোঁট। গায়ের রঙ পরিষ্কার। তবে ও ফর্সা নয়। লাবনীকে নিয়ে আসেন শান্তদা। ওর পূর্বাশ্রমের কোন ঠিকানা কারোর জানা নেই। কেননা ও কথা বলতে পারেনা। কলকাতা থেকে রাতে গাড়ি চালিয়ে ব্যান্ডেলে যাওয়ার পথে শান্তদা দেখেন বৈদ্যবাটির কাছে দিল্লী রোডের ধারে একটি মেয়ে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির জ্ঞান নেই। প্রথমে ওকে এক বন্ধুর নার্সিংহোমে নিয়ে যান তিনি। সে জানায় কোনও কারণে মেয়েটিকে কেউ গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গিয়েছে। গাড়ির গতি কম ছিল বলেই ও বেঁচে আছে। অথবা ভয় পেয়ে দৌড়তে গিয়ে রাস্তায় পড়ে মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে ছিল। জ্ঞান ফিরলে বোঝা গেল মেয়েটি বোবা। ইশারা ইঙ্গিতে নিজের মনের ভাব বোঝায়। কথা বলতে পারেনা।

নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাবার পর ওকে থানায় জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন শান্তদা। বন্ধুটিই বলে, "ওকে যে অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তুললি আবার সেখানেই ফেরৎ পাঠাচ্ছিস? থানায় ভর্তি হওয়া মানেই ওকে ওরা হোমে চালান করবে। কে জানে ও কোনও না কোনও হোম থেকেই পালিয়েছে কিনা? তার থেকে ওকে তোর নিরুদ্দেশ নগরে নিয়ে যা। স্বস্তিতে বাঁচবে।"

এখানে আসার পর দীর্ঘদিন ওকে হেনাদি সামলেছেন। এই পরিবেশে খানিকটা সাব্যস্ত হলে লাবনীকে নিরুপমাদির কাছে রাখা হয়। নিরুপমাদির বয়স হয়েছে। একা সব কাজ করে উঠতে পারেন না। তাছাড়া ওনার একা থাকাও ঠিক না। লাবনী ওকে আগলে রেখেছে। ওর লাবনী নাম নিরুপমাদি দিয়েছেন।

ভাইবোন সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দেবার পর একদম একা হয়ে গিয়েছিলেন নিরুপমাদি। কেউ দেখত না। খোঁজখবর নিতনা। সরকারী চাকরি শেষ হতে, বাড়ি বিক্রি করে এখানে চলে এসেছিলেন। ভাই বোনেদের নিজের ঠিকানা দেননি। কয়েকমাস অন্তর একবার পেনসান তুলতে শহরের ব্যাঙ্কে যান। এটা ওটা কিনে আনেন। সবাইকে দেন। বাকি টাকা সমবায়ে দান করেন। লাবনী সঙ্গে থাকায় প্রাণ ফিরে পেয়েছেন যেন। এখন বলেন, "লাবনী মা বড় মিষ্টি। আমার মেয়েই ও। আমি ওর "সিঙ্গল মাদার"।"

নিরুপমাদির বাড়িটি মাটির দোতলা। পাকা বাড়ির সারির একদম শেষে। লাল টালির চালে লতানে কুমড়ো গাছের বাড়বাড়ন্ত। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিল ও। মাটির দাওয়ায় পথের দিকে পেছন ফিরে বসে লাবনী মাটির সরস্বতী প্রতিমা তৈরী করছে। ভারী সুন্দর ওর হাতের কাজ। সেই দেখতেই আসা।

ঘরের ভেতর থেকে নিরুপমাদি বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা ডিসে দুটো বাতাসা। অন্য হাতে কাঁসার গ্লাসে জল। একটু হেসে নিচু গলায় বললেন "নাও, ধর।"

ও অবাক হয়ে তাকায়। উনি ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে কথা বলতে বারণ করেন। নবীনা ধপ্ করে মাটির দাওয়ায় বসে জলের গ্লাসে চুমুক দেয়। ওর দৃষ্টি প্রতিমার দিকে। লাবনী মাটি দিয়ে ধীরে ধীরে মাকে গড়ে তুলছে। সরস্বতীর মূর্তি। হাঁসের ডানা দুটো আকাশে মেলা। কিন্তু এ বিদ্যে ও পেল কোথায় ? তাহলে কী ও কুমোর পাড়ার মেয়ে ?

# # #

দুপুরে আজ বেশ ভালো রান্নাবান্না করেছে ঝুমুর। বাড়ির জমিতে গজানো কলমী শাক ভাজা। ডিমের ডানলা। আর জঙ্গলে পাওয়া আমড়ার চাটনি। খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে হাত চাটছিল নবীনা। ঝুমুর আর মনুয়ার হাসি দেখে মনে হল কাজটা ভালো করেনি ও।

ডিম পাওয়া যায় এবাড়িতেই। বাড়ির পেছনে যে চমৎকার বাগান, তারই এক অংশে কাঠকুটো দিয়ে ঘর বানিয়ে কয়েকটা মুরগী পুষেছিল মনুয়া। শান্তদা জানতে পেরে আরো খান ছয়েক মুরগী শহর থেকে এনে দিয়েছিলেন ওদের। তাছাড়া মুরগী পালনের বইও কিনে দেন তখনই। ফলে মহানন্দে ও আর ঝুমুর মুরগীর যত্ন শুরু করে। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে ত্রিশ হয়েছে। ওদের পাঠানো ডিম লাইব্রেরির ভান্ডারে জমা পড়ে। সেখান থেকেই বিলি হয়। বাড়িতে যেকটা থাকে তাতে ওদের অভাব মিটিয়ে বাদবাকি কিছু ওরা অন্য মানুষকে দান করে।

তবে ওদের এই মুরগী পালনের একটা নিয়ম আছে। কোনও মুরগী মারা গেলে ওরা তাকে জঙ্গলে পুঁতে দিয়ে আসে। আর কেটে খাওয়ার জন্য ওরা মুরগী বিক্রি করেনা।

ঝুমুর নবীনাকে অসম্ভব ভালোবাসে। ওর জীবনের ভালো দিনের শুরু যে নবীনার জন্য সেকথা ও এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনা।

ঝুমুর উদ্ধার নবীনার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্ব। ঝুমুর বলেছিল, "দিদি, আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনিই মারা পড়বেন।"

ও জানতে চেয়েছিল "কেন ? সমস্যাটা কী ?"

ঝুমুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন জেদাজেদি করার পর একদিন অনেককষ্টে আসল ঘটনাটা জানতে পারে ও। ঝুমুরের সৎ বাবার নাম লোকরঞ্জন শেঠ। শহরে সবাই ওর নাম জানে। খুব প্রভাবশালী মানুষ। হার্ডওয়ারের চালু ব্যবসা। পয়সা আছে। তাই সব দিক সামলানোর জন্য গুন্ডাও পোষে। ঝুমুরের মা নেহাতই নিরীহ মহিলা। রীতিমত সুন্দরী। স্বামী মারা যাবার পর সংসার চালাতে লোকরঞ্জনের অফিসে সামান্য কিছু কাজ করতে ঢুকে বিপত্নীক মালিকের নজরে পড়েন। বিয়েটা হয়ে যায় তখনই। মেয়েকে নিয়ে নতুন স্বামীর ঘর করতে গিয়েই হয় বিপদের সূত্রপাত।

সতেরো আঠারো বছরের ঝুমুরকে দেখার পর কিছুদিনের মধ্যে নতুন বাবার নতুন বায়না শুরু হয়।সেসব কথা নবীনাকে বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মেয়েটা।দিনের পর দিন লোভ বাড়তেই থাকে।

"জানেন কতদিন বলেছি, আপনি আমার বাবা না ?"

লোকটা উত্তরে বলেছে, "তাহলে তোকে বারবার বললেও আমার কাছে এসে শুস না কেন? একটু আদরই তো করব।"

অনেকদিন অবধি মায়ের কাছে কথাটা চেপে ছিল ও। শেষে বলতে বাধ্য হয়। যেকোনও কারণেই হোক ওকে উত্যক্ত করলেও তখনও পর্যন্ত গায়ে হাত তোলেনি লোকটা। তবে কোনও সময় সেটা ঘটতেই পারে। তাই ও ভয়ে ভয়ে আছে।

"গলায়, হাতে, আঁচড় কামড়ের দাগ হল কীকরে ?" ও জানতে চেয়েছিল।

"মা বাড়িতে ছিল না। হাত চেপে ধরেছিল। ছাড়িয়ে পালাতে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে।"

"তোর মামারবাড়ি নেই ? সেখানে চলে যা।" নবীনা পরামর্শ দেয়।

"এক মামা আছে। তাদের নিজেদের অবস্থাই খুব খারাপ। সেখানে ওঠা অসম্ভব। আর লোকটা বলেছে, পালাবার চেষ্টা করলে মা'কে, আমাকে, দুজনকেই খুন করে দেবে।"

ঝুমুরকে ও বলেছিল, "আর একটা বছর যেভাবে হোক সামলে নে। পরীক্ষার পর তোকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব।"

লোকরঞ্জনের লোভের থাবা থেকে ঝুমুরকে বাঁচাতে, ও এখানে এনে ফেলেছে ওকে। কিন্তু ঝুমুর ভাবে ওর মাকে নিয়ে। যতদিন না ওর মাকে নবীনা এই আরশিনগরে এনে দিচ্ছে, ততদিন ও শান্তি পাবেনা। কিন্তু সে বড় সহজ কাজ নয়। তাছাড়া ও খবর পেয়েছে লোকরঞ্জনের লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে ঝুমুরকে। সেটাই নবীনার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানের খোঁজ যদি কোনওদিন পেয়ে যায়, ঝুমুর বাঁচবে কীকরে ?"

ঝুমুরকে বললে ও দাঁত বার করে। বলে "আসুক না, বাড়িতে মুনিয়া আছে। আমি আছি। দু'দুটো বঁটি আছে। মরার আগে দু'একটাকে আমরা মেরে মরব।"

ঝুমুরের বৃত্তান্তের প্রায় সবটাই জানেন শান্তদা। ও বলেছে। ও বলেছিল, " কী হবে শান্তদা ?"

শান্তদা ভারি অদ্ভুত একটা কথা বলেন। "এই আরশিনগরে ঢোকার মুখের ছবিটা দেখেছ ?"

"হ্যাঁ। দুটো বালা পরা হাত বাঁশি বাজাচ্ছে।"

"ওই বাঁশি সবকিছু জানে। কী হবে, কী হবেনা, সব।"

"তাহলে বাঁশির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব।"

"তা তো বলিনি। জলে ভেসে থাকার জন্য হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই হবে। তবে ভাসা যাবে কী যাবেনা, সেটা কিন্তু জল জানে আর ওই বাঁশি জানে।"

শান্তদাকে জানানোর পর থেকেই এই বাড়ির বারান্দায় ভূষণদা শুচ্ছে।

ঝমুর জানতে চেয়েছিল নবীনার কাছে, "ভূষণদা হঠাৎ এবাড়িতে শুতে আসছে কেন ? তুমি জানো কিছু ?"

ও বলেছিল, "না আমি জানিনা। বাঁশি জানে।"

ওরা কী বুঝল কে জানে, চুপ করে গেল।

মনুয়ার ব্যাপারটা একদম আলাদা। ও এসেছে সুন্দরবনের কাছের একটা হোম থেকে। ঝড়ে বা বন্যায় ওখানে প্রায়ই সবকিছু ওলটপালট হয়। তখন দিনের পর দিন না খেতে পাওয়া মানুষগুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে শান্তদাদের এনজিও কাজে নামে। সেসময় ওই হোমের অবস্থাও খারাপ হয়েছিল। সরকারী সাহায্য না আসায় না খেতে পেয়ে হোমের সব মেয়েরাই ধুঁকছিল। মনুয়ার দুরবস্থা দেখে ওকে এখানে চিত্রাদির কাছে নিয়ে আসেন উনি। না খেতে পেয়ে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ওর মাথাতেও গোলমাল দেখা দিয়েছিল। এখানে আসার পর ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিক হয়েছে। চিত্রাদির কাছে থাকত। চিত্রাদির যত্নে ও হারানো জীবন ফিরে পেয়েছে। মনুয়া যোগব্যায়ামও শিখেছে চিত্রাদির কাছে। ওর কাছে ঝুমুরও যোগ শিখেছে। মাঝেমাঝে ওরা দুজনে ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে যোগ দেখায়। অনেকেই দেখে প্রশংসা করেছে।

শান্তদার পাল্লায় পড়ে হেনাদিদের ব্যবস্থায় একবার "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটি ওই ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণেই মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাতে চাকরের ভূমিকায় ছিল শালিনী। মেয়েরাই সব চরিত্রগুলো করায় পুরুষরা কেউ সুযোগ পায়নি। শান্তদার কাছে খবর পেয়ে ও এসেছিল নাটক দেখতে। কোন বিজলিবাতির ব্যাপার নেই, জেনারেটার নেই। মোমবাতি আর ল্যাম্পের আলোয় অনুষ্ঠান দেখার সেই অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। সেদিন ওর মনে হয়েছিল সভ্যজগতের ওই আলো, পাম্পের জল খুব একটা অপরিহার্য নয়। তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ সবাই মিলে খেয়ে পরে বেঁচে থাকায়।

ঝুমুরদের কাছে চা খেয়েই ও বেরিয়ে পড়ল। বিদেশকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার। দেখে ডাক্তার বাবুকে রিপোর্ট দিতে হবে। রাস্তায় যেতে যেতেই নজরে এল শালু বেশ বড় একটা কাঠের খন্ড টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। ওকে দেখেও হাসল না। কোন কথা বলল না। যেন চেনেই না।

বিদেশকে ও ঘরে পেলনা। বাগানের দিকের বড় ইঁদারা থেকে ও জল তুলছে লাগানো বালতিতে। একটু একটু হাঁফাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। বিদেশ কথা শুনল না। বড় বালতিটা টেনে ঘরে নিয়ে এল। এখানে কাঠের উনুন, অথবা স্টোভ। ও তাড়াতাড়ি বাটিতে একটু গরম চায়ের জল বসিয়ে দিল। গতকাল অতটা জ্বর ছিল ছেলেটার। আর আজ একটু ভালো হয়েই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

বিদেশকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এলো নবীনা। বারান্দার সামনে একটা টুলে ওকে বসিয়ে বিছানা ঝেড়ে ঘরে দোরে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। গতকালের পোশাকটাই পরে আছে ছেলেটা। নবীনা কপালে হাত লাগিয়ে দেখল একবার। জ্বর নেই।

"স্নান করেছিলে ?"

"না। গরম জলে গা মুছে মাথা ধুয়ে নিয়েছি।"

ঘরের আলনা থেকে একটা কাচা গেঞ্জী আর জামা এনে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নবীনা হাসল এবার। "যাও, বাথরুমে গিয়ে পালটে এসো।"

সাড়া শব্দ না করে উঠে গেল বিদেশ।

দুকাপ চা আর বিস্কুট এনে বিদেশের মুখোমুখি বসল নবীনা। বিদেশের ছাড়া কাপড় ও কেচে শুকোতে দিয়েছে। শোবার ঘরের বিবেকানন্দের ছবির সামনে টেবিলের ধূপদানিতে ধূপ জ্বেলে দিয়েছে। এই ধূপ শহর থেকে গতবারেই ও এনে দিয়েছিল।

কিন্তু বিদেশ এখনও ওর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না।

"কী হল তোমার ? এত অস্বস্তিতে আছো কেন ? তাকাও আমার দিকে। তাকাও।" বিদেশের থুতনি ধরে মুখটা তুলে ধরে ও। দুটো চোখে টলটল করছে জল। কাঁদছে বিদেশ।

"তোমার কী হয়েছে আমাকে বলবে ?" নবীনা ধীর ভাবে বলে।

বিদেশ উঠে পড়ে। "ঘরে চল। বলছি।"

ওর পেছন পেছন নবীনা ঘরে যায়। একগ্লাস জল নিজে খেয়ে বিদেশকে দেয়। বিছানায় আধশোওয়া হয় বিদেশ। শরীরে এখনও ক্লান্তি আছে হয়ত।

বারান্দায় ল্যাম্পটা জ্বলছে। সন্ধে নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ। ওর দিকে তাকায় বিদেশ। ওর চোখের মণি অন্ধকারেও দ্যাখে নবীনা। কেমন জলে ভাসা নৌকার মত লাগে। নবীনা উঠে বিছানার আর একটা চাদর ওর গায়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর মোড়া টেনে জুত করে বসে।

"আমার কথা এখানে বিশেষ কেউ জানে না। আমি হেনাদির সূত্রে এখানে আসি। হেনাদির বালিগঞ্জে বাপের বাড়ি। তার পাশেই আমাদের বাড়ি। আমার বাবাকে হেনাদি দাদা বলতেন।"

নবীনা চুপ করে বসে থাকে। বিদেশ চাদরের মধ্যে থেকে একটা হাত বার করে একটু ঝুঁকে নবীনার হাতটা নিজের হাতে নেয়। আবার স্থির হয়ে বসে।

"আমার যখন এগারো বছর বয়স, আমার মা মারা যান। হঠাৎ করে হার্টফেল। দিব্যি সুস্থ মানুষ দেখে আমি স্কুলে, বাবা তার চেম্বারে গিয়েছেন। দুটো নাগাদ মা রান্নাঘরেই পড়ে যান। বাড়ির সর্বক্ষণের লোক বীণাদি ডাক্তারকে ফোন করে। বাবাকে জানায়। কোন লাভ হয়নি।

মা মারা যাবার পর বাবা আমাকে দেরাদুনের কনভেন্টে পাঠিয়ে দেন। তিনি ছিলেন ব্যস্ত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট। আমাকে দেখাশুনার সময় তার ছিলনা। স্কুলের ছুটি পড়লে আমাকে নিয়ে পাহাড়ে যেতেন। মা মারা যাবার পর মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মদ, সিগারেট, ত্যাগ করেন। আমিষ খাওয়া ছেড়ে দেন। আমি তার কাছেই ধ্যান করতে শিখি। কতসময় পাহাড়ের এক কোণে বসেও আমরা ধ্যান করেছি।"

নবীনা বলে "অদ্ভুত লাগছে। আমার মাও আমাকে একদম ছোটতে ছেড়ে চলে যান। আমি বাবার তুতো বোন পিসিমনির কাছে বড় হই। এখনও তার সঙ্গেই থাকি। আমার জীবনে আবার দ্বিতীয় সুনামী আসে। তার আঘাত আমি মানলেও আমার বাবা মানতে পারেননি। তিনি চলে যান ঠিক সেই দুর্বিপাকের বছরে।"

"এবার আমি বলি ? কাউকে কিছু বলতে না পেরে আমি হাঁফিয়ে গিয়েছি। আমাকে একটু বলতে দেবে নবীনা ?"

"বলো।" নবীনার যে হাতটা বিদেশ ধরে আছে, সেটা প্রচন্ড ভাবেই ঘামছিল। ও ওর হাত হাল্কাভাবে ছাড়াবার চেষ্টা করে। পারে না। বিদেশ চেপে ধরে আছে হাতটা।

"আমার বাবা ঠিক করেছিলেন আমাকে সংসারী করে তিনি হিমালয়ের কাছাকাছি কোথাও ঘর নিয়ে থাকবেন। কিন্তু সে বাসনা তার মেটেনি। আমার বিয়ের বছরেই তার ক্যান্সার হয়। মাস আটেক বাদে তিনি চলে যান। আমি গোপাকে চিনি স্কুল থেকে। বাবা কোনদিনই গোপাকে তেমন পছন্দ করেন নি। মেনে নিয়েছিলেন। সমবয়সের বিয়েতে তার আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তি আমি গ্রাহ্য করিনি। ভালো রেজাল্ট করে মোটা মাইনের ইঞ্জিনিয়র হবার পর আমি গোপাকে বিয়ে করি।"

নবীনা নড়েচড়ে ওঠে। "আজ অনেকটা হল। আমায় ডাক্তারবাবুকে তোমার খবর দিয়ে ঝুমুরদের বাসায় ফিরতে হবে তো। কাল বাকিটা শুনব।"

"না। আজই। সময় কখন, কিভাবে ফুরোয়, কেউ জানে না। তোমায় আজ যেতে দেব না। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। থাকবে। হেনাদি আমাদের দুজনের খাবারই দেবে। বলে রেখেছি।"

"তারপর কালকের মত কান্ড করে লজ্জা পাও যদি ?"

"আর হবেনা। কাল জ্বরের ঘোরে, থাক ওসব কথা। যা বলছিলাম। বাবা চলে যাবার পর আমাদের ছেলে হল। ছেলের একবছর বয়স হতে না হতেই গোপা কেমন পালটে যেতে লাগল। পোশাক-আশাক, চলাফেরা, মেলামেশা সমস্তটাই ...! আমি বারণ করলেও শুনছিল না।"

নবীনা হাসে, "তারপর একদিন বাড়ি ফিরে দেখলে তোমার বেডরুমের খাটে অন্য পুরুষ, তাই তো ?"

"তুমি জানো ?" বিদেশ ক্লান্ত গলায় বলে।

"না জানি না। আবার জানিও। গল্পটা খুব একটা আনকমন নয়। এমনই হয়, লাগাম ধরতে না জানলে লাগাম ছেড়ে যায়। তখন ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।"

"গোপাকে আমি খুব ভালবাসতাম। তার থেকে অনেক বেশি টান ছিল আমার ছেলে শাওনের ওপর।"

"যদি বলি না। তুমি কোনদিন কাউকে ভালবাসনি। ভালবাসার কোন পাস্ট টেন্স নেই। ভালোবাসায় কোন প্রত্যাশা থাকে না। ওকে ঠিকঠাক ভালবাসলে তুমি অস্থির হয়ে এখানে চলে আসতে না। তুমি নিজেকে ভালবাস। তোমার নিজের অহংএ আঘাত লেগেছিল। আসলে আমরা ভালবাসতে জানি না। পারি না। ভালোবাসলে মুঠো আলগা করতে হয়। সব দুহাতে চেপে ধরে রেখে ভালোবাসা হয়না।"

বিদেশ মুখে হাতচাপা দেয়, "জানিনা। তুমি কী বললে কিছুই বুঝিনি। এবার ভাবব।"

"আমি যাই।"

"না নবীনা। শুধু আজকের দিনটায় আমার কাছে থাকো। শুধু আজ। আমার ভীষণ একা লাগছে।"

# # #

(চলবে)

ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা **সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায়। ২০০১ সালে "দেশ" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

BALCONY

The English publication from Batayan group
April 2021

Inaugural issue of Balcony now available for purchase as a Digital Download !!

Over the years, Batayan has always sought to include contributions in both English and Bengali, making it a truly multicultural and a uniquely cross-lingual magazine. The popularity of the English Section of Batayan has soared over time, so much so that we are now proud to announce the inaugural issue of Batayan's entirely English edition – "Balcony".

This very special first edition of Balcony has been lovingly put together by our guest editor Prof. Krishna Sen, from Perth, Western Australia.

We are proud to feature contributions from indigenous and first nation writers such as Alf Taylor and Robert Mast there are stories, poems, travelogues, essays and a very special translations from Srijato's "*Tara bhora akasher niche*" – "Under the starry sky".

We are offering digital pdf download of this edition for a nominal fee of US$3.00.

Please follow the link below to purchase and download the digital copy and support Batayan's new venture – Balcony.

https://payhip.com/b/xa4j

এক বাক্স চকলেট Batayan Inc প্রকাশনার নতুন বই নানা স্বাদের গল্প ও রম্যরচনায় জমজমাট

আপনার copy পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ।
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সহ অন্যান্য দেশেও পাওয়ার ব্যবস্থা আছে ।
যোগাযোগের বিবরণ (কলকাতা) – সুব্রত মিত্র (৯৪৩২০৮৬৫৮৪) অথবা kajalneo@gmail.com